দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

৬৬ বর্ষ, ২৯ সংখ্যা।। ৩১ মার্চ - ২০১৪।। ১৬ চৈত্র - ১৪২০।।
website : www.eswastika.com

মোদীনমিক্স

নজরকাড়া বিজেপি প্রার্থী বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রে

দেবশ্রী চৌধুরী

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

তৃণমূলকে মুসলিম সাম্প্রদায়িক দল বলা
হবে না কেন? ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

খোলা চিঠি : প্রধানমন্ত্রী মমতাকে আগাম অভিনন্দন ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

আর এস এস-কে গান্ধী হত্যাকারী বলা একটি
দণ্ডনীয় অপরাধ ▯ ড: গোপেশ চন্দ্র সরকার ▯ ১২

অর্থনীতির পুনরুদ্ধারে এক নতুন তত্ত্ব মোদীনমিক্স ▯ কাঞ্চন গুপ্ত ▯ ১৪

অর্থনীতি উদ্ধারে কোনও রকেট বিজ্ঞানের
প্রয়োজন নেই▯ অশোক মালিক ▯ ১৭

কেন মোদী? ▯ হাফিজ ইব্রাহিম ▯ ১৯

মধুমাস ▯ নবকুমার ভট্টাচার্য ▯ ২১

বর্গভীমা মন্দির, তমলুক ▯ ড. প্রণব রায় ▯ ২২

মর্মে ও কর্মে রঙ লাগানোর গান ▯ ২৩

সব কিছুই সকলের মনোমত নাও হতে পারে, তবু পছন্দের
সেই একজনই ▯ এম জে আকবর ▯ ২৭

সর্বজনীন পিঠে ব্যাগ এবং স্কুলের ছেলেমেয়েরা ▯ রমাপ্রসাদ দত্ত ▯ ২৯

মুক্তির দিন আগত ওই : মোদীর দিন আগত ওই ▯ শ্রীচৈতন্য বর্ধন ▯ ৩১

ধর্মের দীক্ষার সঙ্গে ধর্মরক্ষার দীক্ষা দিতে হবে ▯ অমলেশ মিশ্র ▯ ৩২

কেন আমি বিজেপি-তে যোগদান করলাম ▯ ড. বিক্রম সরকার ▯ ৩৫

ভোট-কথা : মোদী হাওয়াতেই সওয়ার হতে চাইছেন

বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দেবশ্রী ▯ ৩৭

সাক্ষাৎকার : পাহাড়বাসী-আদিবাসীবহুল ডুয়ার্স ও সমতলের মানুষের
সমস্যার সমাধান করবে বিজেপি : এস এস আলুওয়ালিয়া ▯ ৩৯

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

পৃঃ ১৪-১৮

নিয়মিত বিভাগ

নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ ▯ ▯ অঙ্গনা : ২৬ ▯ ▯ অন্যরকম : ৩৩
▯ সমাবেশ-সমাচার : ৪০-৪১

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য
সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য
প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৬ বর্ষ ২৯ সংখ্যা, ১৬ চৈত্র, ১৪২০ বঙ্গাব্দ
যুগাব্দ - ৫১১৫, ৩১ মার্চ - ২০১৪

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩
সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬
৮৬৯৭৫২১৪৭৯
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪,
৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

দেশ কি তাহলে আই এস আই-এর খপ্পরে?

নরেন্দ্র মোদী দাঙ্গাবাজ, তিনি প্রধানমন্ত্রী হলে দেশ নাকি টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। তাই তাঁর বিরুদ্ধে এত কুৎসা, অপপ্রচার ইত্যাদি। কিন্তু দেশ যে ধীরে ধীরে আই এস আই-এর খপ্পরে চলে যাচ্ছে সেদিকে আমরা নীরব। আজ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের ফলে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক ও সামাজিক সঙ্কট ঘনীভূত। এই নিয়েই এবারের বিষয়— দেশ কি তাহলে আই এস আই-এর খপ্পরে?

লিখেছেন— বিমল প্রামাণিক ও কল্যাণ ভঞ্জ চৌধুরী

HB ®

INDIA'S NO. 1 IN ISI MARKED HEAVY PIPE FITTINGS

HB ® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.

Authorised Distributor

NATIONAL PIPE & SANITARY STORES

54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833

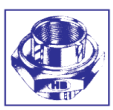

3, Jadu Nath Dey Road,
Kolkata-12, Ph. 2215-6804,
Fax : 2212-2803

Sister Concern

Partha Sarathi Ceramics

4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE ®

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

নির্বাচনী নাটক

লোকসভা নির্বাচনের পূর্বেই বিজেপি-কে ঠেকাইতে প্রয়োজনে কংগ্রেসের হাত ধরিবার ইঙ্গিত দিয়াছেন সিপিএম পলিটব্যুরো সদস্য তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। আবার ভোট মিটিয়া যাইবার পর বিজেপি-কে ঠেকাইতে প্রয়োজনে কংগ্রেসের হাত ধরিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে তৃণমূল কংগ্রেসেরও। বিজেপি-কে ঠেকাইতে এবার বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খাইবার সম্ভাবনা? তাহা হইলে এই তিন দলের পরস্পরের বিরুদ্ধে নির্বাচনে লড়িবার নাটক কেন? এই তিন দলের লক্ষ্য যখন একই, তিন দলের রীতি-নীতি যখন ভিন্ন নয়, তখন এই গটআপ লড়াই হাসির খোরাক হইতেছে। কংগ্রেসের দুর্নীতি আজ সুবিদিত। বামফ্রন্ট আমলের নানা দুর্নীতির কাহিনীও জনসাধারণের অজানা নয়। বহু দুর্নীতি আজ প্রকাশিত হইতেছে। ক্ষমতায় আসিবার পর তৃণমূলের দুর্নীতিও লক্ষ্য করা যাইতেছে। সারদাকাণ্ড লইয়া যাহা চলিতেছে তাহাকে কি বলা যাইতে পারে? পঞ্চায়েতে বামফ্রন্টের দুর্নীতি বন্ধ হইলেও তৃণমূল সেইস্থান অধিকার করিয়াছে। বৈষম্য অবিচার সমান তালে চলিতেছে। কংগ্রেসী বৈষম্য, বামফ্রন্টের বৈষম্য আর এখন তৃণমূলের বৈষম্য মানুষ দেখিতেছে। নারী নির্যাতন লইয়া তিন দলেরই দৃষ্টিভঙ্গি এক। অন্যদিকে তিন দলেরই মূল ভিত্তি মুসলিম তোষণ এবং উন্নয়নের নাম করিয়া গরীবকে লুণ্ঠন।

তিন দলই বলিতেছে বিজেপি দাঙ্গাবাজ ও সাম্প্রদায়িক দল। দেশ স্বাধীন হইবার প্রাক্কালে ৪৬-এর দাঙ্গা কাহারা করিয়াছিল, সেই দাঙ্গায় কাহাদের সমর্থন ছিল, সেদিন কমিউনিস্ট দলের কি ভূমিকা ছিল তাহা পর্যালোচনার প্রয়োজন। বিহারে ভাগলপুরে কাহারা দাঙ্গা করিয়াছিল এবং সেই দাঙ্গায় কংগ্রেসের ভূমিকা কি ছিল, ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর শিখ নিধন যজ্ঞে কংগ্রেসের মদত এবং সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের মুজাফ্‌ফরনগরের দাঙ্গায় ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশ পরিয়া কাহারা দাঙ্গা করিল তাহা জনগণ দেখিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে ক্যানিং, দেগঙ্গা, বারাসত, নলিয়াখালির দাঙ্গায় তৃণমূলের ভূমিকা এবং এই দাঙ্গার সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নীরব থাকিয়া কাহাদের সমর্থন করিয়াছিলেন। ইমাম ভাতার নামে মুসলমানদের ভোট কিনিবার পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কতটা ধর্মনিরপেক্ষ সেই প্রশ্ন সংগত ভাবে করা যাইতে পারে।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের দিন যতই নিকটবর্তী হইতেছে স্বঘোষিত অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি ক্ষমতার মধু আহরণের সম্ভাব্য রাস্তা খোলা রাখিতে তৎপর হইতেছে। বামদলগুলি একটি বিকল্প নীতিকে রূপায়ণের দাবিতে এবারের নির্বাচনে অবতীর্ণ হইয়াছে বলিয়া বিভিন্ন নির্বাচনী জনসভায় প্রচার করিতেছে। এই নীতিটি যে কংগ্রেস-বিরোধী নীতি নহে তাহা বলা বাহুল্য। ভারতবর্ষের এই নির্বাচনে সকলের লক্ষ্য যখন বিজেপি-কে ক্ষমতা হইতে দূরে রাখা তখন কংগ্রেস সিপিএম তৃণমূল একজোট হইয়া লক্ষ্য সাধনে তৎপর হইতেছে না কেন? অকারণ বাক্যাড়ম্বর ও অর্থের এবং সময় অপচয় করিয়া জনতাকে বিভ্রান্ত করিবার এই অপচেষ্টা কেন? শুধুমাত্র ছলনা আশ্রয় করিয়া অভীষ্ট লাভ কি সম্ভব?

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

মেয়েদের পূজা করেই সব জাত বড় হয়েছে। যে-দেশে, যে-জাতে মেয়েদের পূজা নেই, সে-দেশ সে-জাত কখনও বড় হতে পারেনি, কস্মিন্‌কালে পারবেও না।

তোদের জাতের যে এত অধঃপতন ঘটেছে, তার প্রধান কারণ এই সব শক্তি-মূর্তির অবমাননা করা। মনু বলেছেন, 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। যত্রৈত্যস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ।'

যেখানে স্ত্রীলোকের আদর নেই, স্ত্রীলোকেরা নিরানন্দে অবস্থান করে, সে-সংসারের —সে-দেশের কখনও উন্নতির আশা নেই। এজন্য এদের আগে তুলতে হবে।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

ভারতে সাংসদ-প্রতি ভোটার সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান বলছে ভোটার তালিকায় সর্বশেষ নথিভুক্তিকরণের সংখ্যা এই মুহূর্তে ৮৪ কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছে। এই সংখ্যাই শেষ পর্যন্ত দেশের ৫৪৩ জন সাংসদকে নির্বাচিত করবে— এই হিসেবে প্রতিটি সাংসদ গড়ে ১৫.৫ লক্ষ নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতিনিধিত্ব করবেন। ১৯৫১-৫২ সালে দেশের প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচনের তুলনায় এই সংখ্যাটা চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে (সারণী-১ দ্রষ্টব্য) দেশের জনসংখ্যা বাড়লে ভোটার সংখ্যা বাড়বেই। কিন্তু ১৯৭৭-এর পরে আর লোকসভার আসন বাড়েনি। তাই অনেক বেশি মানুষের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ সাংসদরা পেয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু এতে গুণগত মানে যে আঘাত লাগছে সে নিয়ে রাজনৈতিক মহল একমত। রাজ্যকেন্দ্রিক এই তথ্য আরও বিস্ময়কর। আসন্ন নির্বাচনে রাজস্থানের একজন সাংসদ গড়ে ১৮ লক্ষ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করবেন। অন্যদিকে, কেরলে একজন সাংসদ গড়ে ১২ লক্ষ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করবেন। স্বাভাবিকভাবেই এই বৈষম্য দেশের গণতন্ত্রের স্বতন্ত্র বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতার কাজ করবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

আরও গুরুত্বপূর্ণ যে এই পরিসংখ্যান কিন্তু শুধুমাত্র বড় রাজ্যগুলির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল কিংবা অতি ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে এর আওতায় আনা হয়নি। যেমন লাক্ষাদ্বীপের ভোটার সংখ্যা ৫০,০০০-এর মতো। উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে মেরেকেটে ৪ থেকে ৮ লক্ষ ভোটার পাচ্ছেন একজন সাংসদ। নয়াদিল্লীর সেন্টার ফর স্টাডিজ অব ডেভেলপিং সোসাইটিজ-এর ডিরেক্টর সঞ্জয় কুমার মনে করেন ২০০৮-এ লোকসভা কেন্দ্রগুলির পুর্নবিন্যাসে সংখ্যাগত তারতম্যে অন্তত রাজ্যগতভাবে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। যেমন রাজস্থান বা বিহারের মতো রাজ্যে যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অত্যন্ত বেশি সেখানে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়নি। পক্ষান্তরে কেরল বা তামিলনাড়ুর মতো রাজ্য, যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম সেখানেও সাংসদ-সংখ্যা কমানো যায়নি। যার ফলে এই বৈষম্যের উদ্ভব হয়েছে

সারণী-১

একজন সাংসদ কতজন নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতিনিধিত্ব করছেন

বছর	আসন সংখ্যা	মোট নির্বাচকমণ্ডলী (কোটিতে)	সাংসদ প্রতি গড় ভোটার সংখ্যা (লক্ষে)
১৯৫১-৫২	৪৮৯	১৭.৩	৩.৫
১৯৭১	৫১৮	২৭.৪	৫.৩
১৯৯১	৫৪৩	৪৯.৮	৯.২
২০০৯	৫৪৩	৭১.৭	১৩.০২
২০১৪	৫৪৩	৮৩.৯	১৫.৫

সূত্র : নির্বাচন কমিশন

সারণী-২

কয়েকটি দেশে পার্লামেন্টের সদস্য প্রতি ভোটার সংখ্যা

দেশ	হাউজের নাম	গড় নির্বাচকমণ্ডলী/সদস্য
ইংল্যান্ড	হাউজ অব্ কমন্স	৭০
আমেরিকা	হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভস	৭.১ লক্ষ
ব্রাজিল *	চেম্বার অব্ ডেপুটিজ	২.৬ লক্ষ
রাশিয়া *	স্টেট ডুমা	২.৪ লক্ষ
ইন্দোনেশিয়া *	হাউজ অব্ রিপ্রেজেনটেটিভস	৩.১ লক্ষ
ফ্রান্স	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি	৮০
ইটালি	চেম্বার অব ডেপুটিজ	৭৪
পাকিস্তান	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি	২৫ লক্ষ

সূত্র : আন্তর্জাতিক পার্ল ইউনিয়ন, জেনিভা। *আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব

বলে তাঁর অভিমত। প্রকৃতপক্ষে একটি রাজ্যের লোকসভা আসন-সংখ্যা ওই পুর্নবিন্যাসে অপরিবর্তিতই রাখা হয়েছিল। যার ফলে যে রাজ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি সেখানে সাংসদ প্রতি ভোটার সংখ্যা বেড়েছে। অন্যদিকে, যেসব রাজ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম সেখানে সাংসদ প্রতি ভোটারের হার কমেছে।

কিন্তু বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশে সাংসদ প্রতি ভোটার সংখ্যার হার বাস্তবিকই বিশ্বে বিরল। কাছাকাছি রয়েছে আমেরিকা। সেখানে প্রতি হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভ প্রতি ভোটার সংখ্যা ৭ লক্ষের সামান্য বেশি (সারণী-২ দ্রষ্টব্য) বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন এর ফলে রাজ্যওয়াড়ি অধিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব ক্ষেত্রে তারতম্যের সৃষ্টি তো হচ্ছেই। দ্বিতীয়ত, জনপ্রতিনিধি ও জনগণের মধ্যে একটা দূরত্বও তৈরি হচ্ছে। কারণ এক-দেড় মাসের নির্বাচনী প্রচারে কোনও প্রার্থীর পক্ষেই এই বিপুল সংখ্যক ভোটারের দরজায় পৌঁছে যাওয়া সম্ভব হয় না। সুতরাং তাঁরা প্রচারের নানাবিধ আধুনিক কৌশল (যেমন বিভিন্ন সোস্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটের মাধ্যমে প্রচার)-এর পাশাপাশি বড়ো বড়ো হোর্ডিং, পোস্টার কিংবা নিদেনপক্ষে রোড শো'-এর মতো সাবেকি পদ্ধতি ব্যবহার করে কম সময়ে বেশি ভোটারের কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করছেন। যা সুস্থ গণতন্ত্রের লক্ষণ নয় বলেই বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

তাঁরা মনে করছেন এতে প্রার্থীর প্রচার হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু অন্যদিকে নির্বাচকমণ্ডলী উপেক্ষিত হচ্ছেন। কারণ তাঁদের অভাব-অভিযোগ এর মাধ্যমে প্রার্থী ও পরবর্তীতে সাংসদদের কানে পৌঁছছে না। যার জন্য সাংসদদের পক্ষেও তাঁর কেন্দ্রের অধিবাসীদের দৈনন্দিন অভাব অভিযোগ শোনা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হচ্ছে না। পানীয় জল কিংবা চিকিৎসার মতো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাই এক্ষেত্রে অবহেলিত হতে বাধ্য বলেই মনে করা হচ্ছে। কেউ কেউ রসিকতাও করছেন সাংসদদের সঙ্গে নির্বাচকমণ্ডলীর এই দূরত্বে সাংসদেরাই লাভবান হচ্ছেন। অন্তত সম্মানজনক পলায়নের সুযোগ তাঁরা পাচ্ছেন! কিন্তু এহেন রসিকতা সত্ত্বেও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা এড়ানো যাচ্ছে না কোনোমতেই। এর সমাধান তবে কী? বিশেষজ্ঞরা মনে করেন অচিরেই লোকসভা আসন বৃদ্ধি ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই অন্তত লোকসংখ্যা বৃদ্ধির নিরিখে।

মোদীর ওপর মানব বোমা আক্রমণের সম্ভাবনা প্রবল, সতর্ক করল আই বি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দেশের সর্বোচ্চ তদন্তকারী সংস্থা আই বি'র (IB) সূত্র অনুযায়ী বিজেপি-র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদী মানববোমার লক্ষ্য হয়ে উঠেছেন। এইভাবে তাঁর প্রাণনাশের চক্রান্ত চলছে বলেই সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে। ১৯৯১ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে যে কায়দায় অতর্কিতে হত্যা করা হয়েছিল মোদীর ক্ষেত্রেও সেই একই পদ্ধতি অবলম্বনের গোপন তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। একেবারে সুনির্দিষ্টভাবে মোদীকে লক্ষ্য করে সাজানো ছক অনুযায়ী তাঁকে লক্ষ্য করে কোনো গুলি চালানো হবে না। দলীয় সমর্থকের ছদ্মবেশে কোনো এক আত্মঘাতী আততায়ী (suicide bomber) এ কাজে নিযুক্ত থাকবে। সূত্র মোতাবেক এই আক্রমণ মোদীর ভাদোদরা বা বারাণসী যে কোনো একটি নির্বাচন কেন্দ্রেই সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা।

উল্লেখ্য, বিজেপি-র তরফে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তদন্তকারী সংস্থার তরফে 'রেড অ্যালার্ট' জারি করা হয়েছে। কমপক্ষে তিনটি সংস্থার আধিকারিকরা (যার মধ্যে মহা শক্তিধর ন্যাশানাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এন আই এ) রয়েছে। ২০১৩ সালের আগস্ট মাসে গোপনে ট্যাপ করা কয়েকটি ফোনের সূত্র ধরে বর্তমানে কিছু নিশ্চিত সিদ্ধান্ত এসে তারা পৌঁছেছেন।

ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্পেশাল মিডিয়ায় পাওয়া নানান মেসেজ বা বার্তার ছানবিন করে এই সন্দেহ ক্রমশ বিশ্বস্ত ধারণায় রূপান্তরিত হয়েছে বলেই জানালেন তদন্তকারী সংস্থার পদস্থ আধিকারিক।

নিরাপত্তা সংস্থার আধিকারিকরা মূলত লস্কর-ই-তৈবা, ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন বা সিমির ভুতপূর্ব উড়ো সদস্যদের (দাগী-জঙ্গি নয়) মিডিয়ায় আদান-প্রদান করা তথ্যগুলিই বিশেষভাবে নাড়াচাড়া করছেন। অন্যদিকে হিজবুল মুজাহিদিন থেকে ছিটকে আসা কিছু আতঙ্ককারীদের ওপর নজর রাখতে নিরাপত্তা সংস্থার দুটি সেল সক্রিয় রয়েছে।

আই বি-র তরফে ইতিমধ্যেই উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, ও মধ্যপ্রদেশ সরকারের কাছে এ সংক্রান্ত নির্দিষ্ট তথ্যাবলী সরবরাহ করা হয়েছে। এক প্রবীণ আধিকারিকের বয়ান অনুযায়ী এই তিনটি রাজ্যের সঙ্গে সংস্থা এক আপতকালীন যোগাযোগ ব্যবস্থা সর্বদা সক্রিয় রেখেছে।

সংস্থার খবর অনুযায়ী, রাহুল গান্ধী বা কেজরিওয়ালের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার দিকে নজর দেওয়া হলেও মোদীর জনসভাগুলির ক্ষেত্রে বিশেষ দু'টি রাজ্যে সর্বাধিক সংখ্যায় নিরাপত্তাকর্মী নিযুক্ত করার কড়া নির্দেশ জারি হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের ধৃত জঙ্গি ইয়াসিন ভাটকলকে জেরা করে মোদী হত্যা চক্রান্তের নিশ্চিত আভাস পেয়েছেন নিরাপত্তা সংস্থার কর্তারা।

কেজরিওয়ালদের মুখোশ ক্রমশ খুলে পড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ২০১৪ সালের দিল্লী বিধানসভা নির্বাচনের আগে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রচার করে দিল্লীবাসীর মন জয় করেছিল আম-আদমি পার্টি। পরবর্তীকালে সেই আপ পার্টি-ই কংগ্রেস সরকারের সমর্থন নিয়ে দিল্লীতে আবার সরকারও গঠন করেছিল। এই আপ পার্টিও যে কংগ্রেসের মতো দুর্নীতিগ্রস্ত, দিল্লীতে সরকারে থাকার ৪৯ দিনের মধ্যেই দিল্লীর মানুষ তার আঁচ পেয়েছিল।

যতদিন যাচ্ছে ততই প্রকাশ্যে উঠে আসছে কেজরিওয়ালের দলের নেতা-কর্মীদের একের পর এক কাণ্ডকারখানা। সম্প্রতি জানা গেছে আপ-পার্টির নেতা-সমর্থকরা কীভাবে সাধারণ মানুষকে বোকা বানিয়ে দেশ ও বিদেশ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে নিজেদের পকেট ভর্তি করতে শুরু করেছিল। এমনকী এই সমস্ত নেতা আমেরিকার ফোর্ড ফাউন্ডেশন থেকে প্রচুর অর্থ সাহায্য নিয়ে এন.জি.ও-র নামে নিজেদের পকেট ভরিয়ে চলেছে। শুধু তাই নয়, আরো একটি বিশেষ দিক রয়েছে। আম আদমি পার্টির নেতাদের একাংশ কোনো না কোনো ভাবে দেশবিরোধী কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত। এই আপ পার্টির প্রধান নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়ালের এবং মনীষ সিসোদিয়ার একটা এনজিও আছে, যার নাম কবীর। আবার আপ-এর আর এক নেতা মল্লিকা সারাভাই-এর এনজিও দর্পণে এবং যোগেন্দ্র যাদবের এনজিও আই সি এস এস আর তহবিলে যে টাকা আসে তার বেশির ভাগই ফোর্ড ফাউন্ডেশান থেকে। নোবেল পদক প্রাপ্ত অর্মত্য সেনের 'আইডিয়াল অব জাস্টিস' নামক বই প্রকাশ অনুষ্ঠানের জন্যও এই ফোর্ড ফাউন্ডেশান থেকে টাকা এসেছিল। এছাড়াও আম আদমি পার্টির কর্মী তিস্তা শীতলবাদ ও জীবন আনন্দের এনজিও-র জন্যও টাকা আসে এই আমেরিকান সংস্থা থেকে। আর এই টাকাকে কাজে লাগিয়েই মোদীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলার ঘুঁটি সাজাচ্ছে তারা।

এখন প্রশ্ন হলো, এই ফোর্ড ফাউন্ডেশানের ভারতীয় কোনো বিষয়ে, বিশেষ করে রাজনীতির বিষয়ে এতো আগ্রহ কেন? সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক মহল থেকে কোনো সদুত্তর পাওয়া যায়নি। এছাড়া আপ পার্টির সঙ্গে যুক্ত আরো কিছু নেতার কাজকর্ম নিয়েও সন্দেহ আছে। যেমন আপ পার্টির অন্যতম নেতা গোপাল রায় সোনিয়া গান্ধীর পরামর্শ কমিটির সদস্য। সি পি আই এম এল-এর শাখা অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন-এরও তিনি সদস্য যাদের সমর্থন মাওবাদীদের দিকে। অরুণা রায় যিনি আজমল কাসভের ফাঁসিকে রদ করার জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে আর্জি জানিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, তিনি আবার সোনিয়া গান্ধীর পরামর্শদাতা কমিটির সদস্যাও। প্রশান্ত ভূষণ কাশ্মীরে সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক কথার জন্য পরিচিত। আবার তিনি মাওবাদীদের সঙ্গে যুক্ত আছেন। অন্যদিকে মেধা পাটেকরের মতো সমাজসেবী নকসালদের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়াড়াতে বনবাসীদের অনুষ্ঠান থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। অঙ্গনা চ্যাটার্জি যিনি আই এস আই-এর এজেন্ট হওয়ার অভিযোগে সরকার তার বিরুদ্ধে মামলা করেছে। তার সঙ্গে আবার মেধা পাটেকরের যোগসূত্র রয়েছে। এরা সবাই আজ আপ পার্টির সমর্থক। আম আদমি পার্টির যে সমস্ত সাংবাদিক ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত তারা এই পার্টি থেকে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে পার্টির কথা মতো কাজ করছে বলে ওয়াকিবহাল মহলের অভিমত।

জম্মু কাশ্মীরে নতুন জোট মোদীর প্রশংসায় পিডিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ এবার জম্মু-কাশ্মীরে বিজেপি-র সঙ্গে জোট বাঁধতে চলেছে মেহবুবা মুফতির দল পিডিপি। যার অর্থ সে রাজ্যে কংগ্রেস ন্যাশনাল কনফারেন্স জোট বনাম বিজেপি-পিডিপি জোটের দ্বিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়ার সম্ভাবনা। বিজেপি-র সঙ্গে আগেও একবার জোট করেছিল পিডিপি। বর্তমানে রাজ্যে ক্ষমতায় রয়েছে কংগ্রেস ন্যাশন্যাল কনফারেন্স জোট। আর সেই সরকারের ওপর রাজ্যের একটা বড় অংশ ক্ষুব্ধ। তারা বিজেপির দিকে ঝুঁকেছে। জম্মুতে বিজেপি-র ভালো প্রভাব রয়েছে। পিডিপি-বিজেপি জোট হলে তাই সাফল্য অনেক বেশি হবে। পিডিপি সভাপতি মেহবুবা মুফতি বলেছেন, বিজেপি নেতা অটল বিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় কাশ্মীরের মানুষের সঙ্গে পাকিস্তানের যাতে সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে তার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। বাজপেয়ী জম্মু কাশ্মীর সমস্যার সমাধান নিয়ে অনেকটা অগ্রসরও হয়েছিলেন। বাজপেয়ীর উদ্যোগেই কাশ্মীর থেকে লাহোর পর্যন্ত বাসচলাচল করা সম্ভব হয়েছিল। মোদীর বিজেপিও সেই পথে অগ্রসর হবে বলেই বিশ্বাস পিডিপি-র। গোধরা দাঙ্গা নিয়ে বহু দল মোদীর সমালোচনা করলেও কোনও পিডিপি নেতা মোদীকে দোষী সাব্যস্ত করেনি। উল্টে কংগ্রেসের সহ-সভাপতি রাহুল গান্ধীর সমালোচনা করেছে তারা। মেহবুবা মুফতি বলেছেন, দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন করার সুযোগ ছিল রাহুল গান্ধীর। কিন্তু তিনি তা থেকে সরে এসেছেন, যার অর্থ রাহুলকে দুর্নীতির সমর্থক বলা। মেহবুবা এও বলেছেন, দেশের একটা বড় অংশ মোদীকে চাইছে। কাশ্মীর নিয়ে কঠোর অবস্থান নেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই রয়েছে। এজন্যই বিজেপি-র সঙ্গে জোটে যাচ্ছে পিডিপি।

ভোটারদের মন বুঝতে গোয়েন্দা লাগাচ্ছেন রাজনীতিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আসন্ন লোকসভা ভোটের মরসুমে পোয়া বারো বেসরকারি গোয়েন্দা সংস্থাগুলির। আজকাল রাজনীতিকরা শুধু সর্বাধুনিক জন-সংযোগের পন্থাগুলি ব্যবহার করা, ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণ, বা সোস্যাল মিডিয়ায় অংশ নিয়ে ভোট বাড়ানোর কৌশলে নিজেদের আটকে রাখেননি। সাম্প্রতিক সূত্র অনুযায়ী অনেক প্রার্থীই তাঁদের কেন্দ্রের নির্বাচকমণ্ডলীর সুলুক সন্ধান পেতে রাজনৈতিক গোয়েন্দা সংস্থা নিয়োগ করছেন।

এই সংস্থাগুলি কোনো কেন্দ্রের ভোটারদের অসন্তোষ, চাহিদা, দীর্ঘদিনের ক্ষোভ, তাদের জাত-পাত, ধর্মীয় চরিত্র ইত্যাকার নানান বিষয়ের খোঁজখবর জোগাড় করে তাঁর রাজনৈতিক নিয়োগকর্তাকে সরবরাহ করছেন। প্রার্থীর সুনাম ও ভোটারদের মনে তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতার আগাম আভাষ ছাড়াও বিরোধী পক্ষের কোনো কেচ্ছা লুকনো থাকলে তাও গোয়েন্দা বাহিনী টেনে বার করছে। তবে প্রার্থীরা গোয়েন্দাদের দলীয় অন্তর্ঘাতের সম্বন্ধে সর্বাধিক সতর্কতা নিয়ে নজর আন্দাজ চালাতে বলেছেন।

সীমিত সংখ্যার আসনে বহু প্রার্থীরই আসন পাওয়ার বাসনা থাকা স্বাভাবিক। টিকিট বাটোয়ারা হয়ে যাওয়ার পর হতাশ প্রত্যাশীর সংখ্যা বিপুল হয়ে পড়ে। অনেকের বিক্ষুব্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এঁরাই অনেক সময় মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে তলেতলে অন্তর্ঘাত করেন। গোয়েন্দাদের ওপর এঁদেরই চিহ্নিতকরণের মূল দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যাতে এঁদের কাজকর্মে লাগাম দেওয়া যায়। এই তথ্য দিলেন অ্যাসোসিয়েশন অফ প্রাইভেট ডিটেকটিভ অ্যান্ড ইনভেস্টিগেটর ইন্ডিয়ার (এপিডিআই) এর চেয়ারম্যান বিক্রম সিং। শ্রী সিং-এর নিজস্ব সংস্থা এ কাজে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী তদন্তকারী সংস্থাগুলি একেবারে বুথ স্তর থেকে প্রার্থীর জেতার সম্ভাবনা অবধি নাড়ি নক্ষত্রের খোঁজ দেওয়ার চেষ্টা করে। কোন কোন গোঁজ প্রার্থী ভোট কাটতে পারে, বিগত নির্বাচনগুলিতে ওই কেন্দ্রের ভোটাররা কোন কোন দলকে কি শতাংশে ভোট দিয়েছিল বা প্রার্থী যে প্রচার চালাচ্ছেন ভোটদাতাদের ওপর তার প্রভাব সদর্থক হচ্ছে কিনা এমন সব নানান টুকরো-টাকরা কিছুই তাঁরা উপেক্ষা করছেন না। এই সব তদন্ত সংস্থা তাঁদের নিয়োগকর্তাদের সম্বন্ধে চরম গোপনীয়তার শর্তে কাজ করে যাচ্ছেন। কারণ বিশ্বস্ততাই তাঁদের মূলধন। দিল্লী-স্থিত ডিটেকটিভ নেটওয়ার্ক সংস্থার কর্ণধার সুভাষ ওয়াধা জানাচ্ছেন, অনেক প্রার্থী আবার তাঁদের বিরোধী পক্ষের সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহে বেশি আগ্রহী। বিরোধী প্রার্থীর কেচ্ছা বাজারে ছাড়তে পারলে বাজিমাত হবার সম্ভাবনা প্রবল। ধরুন কোনো প্রার্থীর বিরুদ্ধে কোনো কোর্ট কেস চলছে বা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে প্রার্থীকে জড়িয়ে তীব্র কেলেঙ্কারির খবর রয়েছে। এই সব গোপন খবর অতি সঙ্গোপনে ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে সরবরাহ করতে তদন্তকারীদের চাহিদা বাড়ছে। মজার কথা নিয়োগকারীরা কেউই ঘুণাক্ষরেও ভোটের কথা তুলছেন না।

নিঃসঙ্গ, অসহায়....। সৌজন্যে : টি ও আই

ত্রিপুরার পাঠ্যপুস্তকে বিজেপি সাম্প্রদায়িক

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ত্রিপুরার স্কুল পাঠ্য-পুস্তকে এক এক রাজনৈতিক দলের এক এক রকম পরিচয় দেওয়া নিয়ে এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ নজর কেড়েছে। ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন-এর অন্তর্গত একাদশ শ্রেণীর রাষ্ট্র বিজ্ঞানের বইতে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) সাম্প্রদায়িক দল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্য বিজেপি এর বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ জানিয়েছে।

বাম-শাসিত ত্রিপুরা রাজ্যে রাজ্য সরকার তাদের নিজেদের ভাবনাকে পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মগজ ধোলাইয়ের চেষ্টা করছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। ত্রিপুরার প্রায় ১০০-রও বেশি স্কুলে এই ধরনের অপপ্রচার চলছে যা দেখা মাত্রই ত্রিপুরা রাজ্য বিজেপি-র তরফ থেকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে।

একাদশ শ্রেণীর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বইটির লেখক নিমাই প্রামাণিক। এই বইটির প্রকাশন সংস্থা কলকাতার ছায়া প্রকাশনী। বাংলা মাধ্যমের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বইটিতে এই বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে ভারতের পার্টি ব্যবস্থা নামে অধ্যায়টিতে। যেখানে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির গায়ে সাম্প্রদায়িক তকমা লাগানো হয়েছে। মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, শিবসেনা দলগুলির পাশাপাশি ভারতীয় জনতা পার্টির নামও সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে আগরতলার এডি নগর উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের নবম শ্রেণীর পরীক্ষায় প্রশ্ন রাখা হয়— কোনো দল সাম্প্রদায়িক? সেই প্রশ্নের সঙ্গে প্রদত্ত উত্তরে চারটি দলের নাম রাখা হয়— কংগ্রেস, সিপিএম, বিজেপি না বিএসপি। সুতরাং ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে ত্রিপুরা সরকার পড়তে বাধ্য করছে— বিজেপি একটি সাম্প্রদায়িক দল।

তৃণমূলকে মুসলিম সাম্প্রদায়িক দল বলা হবে না কেন?

গূঢ়পুরুষের

কলম

সারা দেশজুড়ে এখন মোদী ঝড়। এখনই উপযুক্ত সময় পশ্চিমবঙ্গের জোটের হাওয়াটা বুঝে নেওয়ার। যাঁরা নিয়মিত খবরের কাগজ পড়েন এবং টিভিতে নির্বাচন নিয়ে তর্ক বিতর্ক শোনেন তাঁরা জানেন রাজ্যে ক্ষমতাসীন তৃণমূল দলের নেত্রী বিজেপি-র উত্থানে বেশ ভয় পেয়েছেন। নেত্রীর ফতোয়ায় তৃণমূল দল এবার লোকসভার নির্বাচনে একলা চলরে নীতি নিয়েছে। এখন বিপাকে পড়ে আঙুল কামড়াচ্ছেন দলনেত্রী। প্রতিটি দলীয় সভায় বিজেপি-কে সাম্প্রদায়িক দল বলে গালি দিচ্ছেন। বিজেপি যে দার্জিলিং লোকসভা আসনটি আবার জিতছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তা ছাড়াও আর দু' চারটি আসন ভোট কাটাকাটির অঙ্কে জিততে পারে। সর্বশেষ জনমত সমীক্ষা জানাচ্ছে যে এবার পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি-র ভোট শেয়ার ১৬ শতাংশে পৌঁছতে পারে। এটি সারা রাজ্যের ৪২টি আসনে প্রদত্ত মোট ভোটের গড় হিসাব। রাজ্যের ৮-১০টি কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীরা ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ ভোট পেতে পারেন। তবে একটা কথা তৃণমূল, সিপিএম ও কংগ্রেসের সমর্থকরা এক বাক্যে মানছেন যে ২০১৪ সালে পশ্চিমবঙ্গে ভোটের ফলাফলের নির্ণায়ক শক্তি বিজেপি। ভোটযুদ্ধে বিজেপি-র সাফল্য তৃণমূল-সিপিএমের বড় বড় রথী মহারথী প্রার্থীদের ধরাশায়ী করবে। রাজ্যের ৪২টি আসনেই বিজেপি প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোট অনেক হিসাব উল্টেপাল্টে দেবে।

তৃণমূল নেত্রী তাঁর প্রতিটি নির্বাচনী প্রচার সভায় বিজেপি-কে দাঙ্গাবাজ সাম্প্রদায়িক দল বলে গলাবাজি করছেন। অথচ তিনি নিজে কী করেছেন তার খতিয়ান নেওয়া যাক্। পরিবর্তনের মিথ্যা স্লোগান দিয়ে বাংলার মানুষকে বোকা বানিয়ে ক্ষমতা দখল করে তিনি রাজ্যের ১০ হাজার মাদ্রাসাকে সরকারি স্বীকৃতি দিয়েছেন। রাজ্যে আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস খোলা হয়েছে। রাজারহাট-নিউটাউন এলাকায় ৩টি হজ টাওয়ার করা হয়েছে। রাজ্যের যে সব জেলায় জনসংখ্যার ১০ শতাংশ মুসলিম সেখানে উর্দুকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে তৃণমূল সরকার। মুসলিম যুবকদের শিক্ষা ও ব্যবসা করার নামে এখন ঢালাও সরকারি অনুদান দেওয়া হচ্ছে। এরপরেও নেত্রী এবং তাঁর দলকে মুসলিম সাম্প্রদায়িক দল বলা হবে না কেন? নেত্রী মহোদয়া অস্বীকার করতে পারেন যে এই সবই তিনি করছেন রাজ্যের প্রায় ৩০ শতাংশ মুসলিম ভোট পাওয়ার স্বার্থে। তিনি বিশিষ্ট বিজ্ঞানী নিউটনের তৃতীয় সূত্রটি ভুলে গেছেন। এই সূত্রে নিউটন বলেছেন, 'এভরি অ্যাকসন হ্যাজ ইটস্ অপোজিট ইকুয়্যাল রিঅ্যাকসন।' পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু পরিবারে জন্মানোটা কি অপরাধ। মসজিদের ইমামরা সরকারি ভাতা পাবেন বলে তৃণমূল নেত্রী ঘোষণা করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছিল, মন্দিরের হতদরিদ্র পুরোহিত সরকারি ভাতা পাবেন না কেন? হিন্দু ব্রাহ্মণ পুরোহিত হওয়াটা কি অপরাধ। রাজ্য বিজেপি নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে ইমাম তোষণ বন্ধ করেছেন। এরপরেও নানাভাবে নেত্রী চেষ্টা চালিয়েছেন ইমাম- মোয়াজ্জেমদের কিছু পাইয়ে দেওয়ার। ভারত ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। দেশের সংবিধান বলেছে বিশেষ কোনও ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য সরকারি তহবিল থেকে খরচ করতে পারে না। তৃণমূল নেত্রী দেশের সংবিধান মানেন না। তিনি মনে করেন তাঁর ফতোয়া সংবিধানের উপরে। বিজেপি তাঁর মুসলিম ভোটের স্বার্থে বাধা দিয়েছে তাই বিজেপি সাম্প্রদায়িক দল। আর তিনি এবং তাঁর দল অসাম্প্রদায়িক। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভাজন করেছে তৃণমূল। বামপন্থীরাও গত তিন দশকের বেশি ক্ষমতায় থাকাকালে প্রকাশ্যে এতটা বাড়াবাড়ি করতে সাহস করেনি। তাই তৃণমূল নেত্রীকে 'সবক্' শেখানোর একটা বড় সুযোগ এসেছে ভোটযুদ্ধে। যদি রাজ্যে মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক বলে কিছু থাকে তবে একান্তই বাধ্য হয়ে হিন্দু ভোটব্যাঙ্কও থাকবে। প্রতিটি ক্রিয়ার পাল্টা প্রতিক্রিয়া থাকবেই। এটাই বিজ্ঞানের সূত্র। তৃণমূল প্রার্থীদের পরাজিত করে এই বার্তাটাই এবার দিতে হবে সকলকে।

ইতিমধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশিত হয়েছে। দলের নেত্রী সকলের জন্য বিনামূলে রোটি, কাপড়া, মকানের ব্যবস্থা করে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বলেছেন, বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএম সবাই দুর্নীতিপরায়ণ। আম আদমি পার্টি গড়ে অরবিন্দ কেজরিওয়ালরা কোটি কোটি টাকা কামাচ্ছেন। সারা দেশে একমাত্র ধোওয়া তুলসী পাতা হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। একদম জানতে চাইবেন না যে সারদা চিটফান্ডের অদৃশ্য হয়ে যাওয়া ৩০ হাজার কোটি টাকা কারা খেয়েছে। জানতে চাইলে জেলবন্দি সাংবাদিক কুণাল ঘোষের দশা হবে। কুণালবাবুর অপরাধ, তিনি আদালতে বিচারপতির কাছে গোপন জবানবন্দি দিয়ে জানাতে চেয়েছিলেন যে সারদা চিটফান্ডের টাকাটা তৃণমূলের কোন কোন নেতা নেত্রী খেয়েছেন। সেই সুযোগ তাঁকে দেওয়া হয়নি। যাতে নির্বাচনের আগে তিনি জবানবন্দি দিতে না পারেন তার জন্য জেলবন্দি করে রাখা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী মমতাকে আগাম অভিনন্দন

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী
ভারত,

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনাকে আগাম অভিনন্দন, সালাম। কদিন যাবৎ আপনার বক্তৃতা শুনতে শুনতে আমার মনে হচ্ছে গোটা ব্যাপারটা আপনার কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। কখনও বলছেন আপনিই ঠিক করবেন কে হবেন প্রধানমন্ত্রী। কখনও বলছেন আপনার নেতৃত্বেই হবে সরকার। আবার বলছেন, আপনার স্বপ্নের ফেডারেল ফ্রন্টই সরকার গড়বে। আবার বলছেন, জয়ললিতা, মায়াবতী, মুলায়ম যে কেউ প্রধানমন্ত্রী হলেই আপনি খুশি। অনেকে বলছে আপনি নিজেই বুঝতে পারছেন না কী হবে। কোনটাই আপনি নিজে বিশ্বাস করেন না তবু বলে যাচ্ছেন। অনেকে আবার বলছে, কংগ্রেসকে সমর্থন দিয়ে ফের কেন্দ্রে পাঠানোর জন্যই আপনি বলছেন এবার শক্ত নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা নেবেন। কিন্তু দিদি আমি বিশ্বাস করি, আপনিই শুধু আপনিই দেশের আগামী প্রধানমন্ত্রী। তাই আপনাকে আগাম অভিনন্দন জানিয়ে রাখলাম। পরে যদি আর সুযোগ না মেলে তাই আগাম জানিয়ে রাখাই ভাল।

আপনি নিজেকে প্রধানমন্ত্রী ধরে নিয়ে যেভাবে দলের ইস্তাহার প্রকাশ করেছেন তা দেখে আমি মোহিত হয়ে গেছি। আপনি বলেছেন, কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে সরকার হলে সেই স্বপ্নের সরকার কী কী করবে। কিন্তু দিদি, দেশ গড়তে ২৭২ জনের বেশি সাংসদ দরকার হয়। আপনার ফ্রন্টও যদি সেই সংখ্যা ছুঁয়ে ফেলে তবু তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে সরকার কীভাবে হবে সেই অঙ্কটা আমার এই মোটা মাথায় ঢুকছে না। আপনার দল তো সব মিলিয়ে ২৭২ জন প্রার্থীই দিতে পারেনি। সব থেকে বেশি যে সমীক্ষা আপনাদের আসন দিয়েছে তারাও বলছে তৃণমূল কংগ্রেস খুব বেশি হলে ৩২টা আসন পাবে। তাই দিয়ে ৫৪৩ আসন বিশিষ্ট বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের শাসক নির্ধারণ করার শক্তি যদি আপনার হাতে আসে তবে সেটা তো গিনিজ বুক অব রেকর্ডসে পাকা আসন করে নেবে। তার জন্যও আপনাকে আগাম অভিনন্দন।

সেদিন আপনার দলের ইস্তেহার প্রকাশ করে আপনি দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে বিচার বিভাগ, প্রতিরক্ষা থেকে প্রশাসন পরিচালনা সব ক্ষেত্রে আমূল সংস্কার করা হবে। কৃষক স্বার্থবাহী, শিল্পবান্ধব, জনমুখী সরকারি নীতি প্রণয়ন করবেন আপনার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা।

আপনি বলেছেন, প্রতিরক্ষা খাতে একের পর এক দুর্নীতিতে জেরবার বিদায়ী ইউপিএ-টু সরকার। তাই আপনারা ক্ষমতায় এলে প্রতিরক্ষা খাতেও ই-টেন্ডারিং চালু করা হবে। খুব ভাল হবে দিদি, সরি, প্রধানমন্ত্রী ম্যাডাম। গোটা বিশ্ব জানতে পারবে ভারত কী অস্ত্র কিনছে। গোটা বিশ্ব ইন্টারনেটে টেন্ডারে অংশ নেবে। আপনি তো নিশ্চয়ই শুধু প্রধানমন্ত্রী নন, পুরনো রেলমন্ত্রকের পাশাপাশি স্বরাষ্ট্র, বিদেশ ইত্যাদি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ সব দপ্তরই নিজের হাতে রাখবেন। ভালোই হবে ই-টেন্ডার দেখে দেখে আপনি অনলাইনে সমারাস্ত্র পারচেজ করবেন। দারুন হবে দিদি দারুন হবে।

বলেছেন সারা দেশের সব রাজ্যে লোকপাল এবং লোকায়ুক্ত চালু করা হবে। কিন্তু দিদি তার আগে পশ্চিমবঙ্গে লোকায়ুক্ত নিয়োগ করে নিলে ভাল হোত না। নইলে মোদীর মতো পাকা লোকেরা প্রশ্ন তুলবে দেশে লোকপালের দাবিদার নিজের রাজ্যেই লোকায়ুক্ত নিয়োগ করতে ভয় পায়। মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানকে আঙুলে করে নাচায়।

জাতীয় সংস্কৃতি উন্নয়ন পর্যদ গঠন করা হবে। বা দিদি বা। এতদিন শুধু টলিউডের সবাই বঙ্গশ্রী থেকে নানা বঙ্গ সম্মান পেয়েছেন। এবার টলি-বলি একাকার হয়ে যাবে।

কিন্তু দিদি আপনার ইস্তেহারে কয়েকটা বিষয় বাদ চলে গেছে। যদি অপরাধ না নেন তবে বলে দিই। আমার মনে হয় তাড়াতাড়িতে ছাপা হয়নি।

১। বিষ মদ খেয়ে দেশে কেউ মারা গেলে তাঁর পরিবারকে সরকারি কোষাগার থেকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

২। দেশের মানুষকে বেশি বেশি সিগারেট খেয়ে বেশি বেশি ট্যাক্স দিতে বলা হবে।

৩। দেশের সমস্ত ইমাম এবং মোয়েজ্জেমকে মাসে মাসে মাইনে দেওয়া হবে।

৪। প্রতিটি ক্লাবকে সুযোগ পেলেই ক্রীড়া ভাতার নামে উৎকোচ দেওয়া হবে। সেই টাকার হিসেব দিতে হবে না। ইচ্ছে মতো খানাপিনাও চলতে পারে।

৫। দেশের সর্বত্র পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়ে দিতে হবে যদি কোনও ধর্ষণের অভিযোগ আসে তবে তার কাল্পনিক চিত্রনাট্য রচনা করে সাজানো ঘটনা বলতে হবে।

৬। একান্ত বেগরবাই করলে সেই পরিবারকে চাকরি-বাকরি দিয়ে কিনে নিতে হবে। না হলে ধোপা-নাপিত বন্ধ।

৭। সারা বছরে ধরে দেশে মেলা হবে। কুম্ভ মেলা এখন আর তিন বছর পর পর নয়। ফি বছর পূর্ণ কুম্ভ মেলা। আর কুম্ভ মেলা কোয়ার্টলি।

এক্ষুনি আর মনে পড়ছে না। তাই থামলাম।

— **সুন্দর মৌলিক**

আর.এস.এস.-কে গান্ধীহত্যাকারী বলা একটি দণ্ডনীয় অপরাধ

ড. গোপেশ চন্দ্র সরকার

হিন্দুত্বের মানবতাবাদী দর্শন (বসুধৈব কুটুম্বকম্) বিরোধী প্রায় সব সংগঠনেরই একটি মুখরোচক শ্লোগান ''আর এস এস গান্ধীহত্যাকারী''। এঁদের প্রায় সকলেই, অজ্ঞতাবশত অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে, মুসলিমদের মন এবং ভোট পেতেই এই 'মিথ্যাস্ত্রটি' হামেশাই ব্যবহার করে থাকেন। এঁদের নিশ্চয়ই জানা নেই যে এই ধরনের মানহানিকর মিথ্যাচার একটি দণ্ডনীয় অপরাধ। কয়েকটি ঘটনা পর্যালোচনা করলেই এই মিথ্যাচারিতার মুখোশ উন্মোচিত হবে। যথা—

১। **হরিয়ানার হিসার আদালতের রায় :** ২০০৩ সালে কলকাতার The Statesman এবং দিল্লীর India Today পত্রিকায় আর এস এস-কে গান্ধীহত্যাকারী হিসাবে দেখানো হয়। এই অভিযোগের বিরুদ্ধে হরিয়ানার প্রান্ত (রাজ্য) সঙ্ঘচালক মাননীয় শ্রী দর্শন লাল জৈন এবং স্বয়ংসেবক আইনজীবী মাননীয় শ্রী বিনোদ গুপ্তাজী, হরিয়ানার হিসার আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন। আদালত The Statesman পত্রিকার প্রধান সম্পাদক সি. আর. ইরানী এবং India Today-র সম্পাদক শ্রী অরুণ পুরীকে তাঁদের ওই লেখার সমর্থনে উপযুক্ত প্রমাণ দাখিল করতে বলেন; কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণ দাখিল করতে না পারায় ওই দুই সম্পাদক আদালতে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করতে বাধ্য হন এবং পরদিন (১০ নভেম্বর ২০০৩) The Statesmen পত্রিকার প্রথম পাতায় পরিষ্কার ভাবে বড় হরফে পাঠকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা সহ হিসার আদালতের রায়টি (**''গান্ধী হত্যার সঙ্গে কোনো ভাবেই যুক্ত ছিল না আর এস এস''**) প্রকাশ করে নিজেদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন (জাগরণ : নভেম্বর, ২০০৩)। সুতরাং এই ধরনের ভিত্তিহীন মন্তব্য করার যে কি পরিণাম হতে পারে--- এই ঘটনায় নিশ্চয়ই তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

২। **তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর রায় :** তখনকার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল গান্ধীহত্যার বিষয়ে ২৭.২.৪৮ তারিখে জওহরলাল নেহরুকে লিখেছিলেন, ''গান্ধী হত্যার ব্যাপারে সঙ্ঘের কোনো সদস্যের সামান্যতম হাত নেই।'' (সঙ্ঘ-গাথা পৃ. ৪১) শুধু তাই নয়, লক্ষ্ণৌতে তাঁর এক প্রদত্ত ভাষণে তিনি আর এস এস এর ভূয়সী প্রশংসাও করেন। (The Hindu 7.01.'48)

> **১৯৩৪ সালে মহারাষ্ট্রের ওয়ার্ধা জেলার সঙ্ঘের শীতকালীন শিবির পরিদর্শনের জন্য গান্ধীজী আমন্ত্রিত হন এবং গভীর পর্যবেক্ষণের পর গান্ধীজী এই কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন।**

৩। **সরকারি জবাবেও সঙ্ঘের নাম নেই :** পরবর্তীকালে মাননীয় বিচারপতি আত্মাচরণের বিশেষ আদালতে দাখিল করা সরকারি জবাবেও সঙ্ঘের কোনো স্বয়ংসেবকের নাম উল্লেখ করা হয়নি। (সঙ্ঘ-গাথা : প. ৪১)

৪। **সঙ্ঘের উপর বলবৎ করা নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার :** গান্ধীহত্যার মিথ্যা সন্দেহে সঙ্ঘের উপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় এবং স্বয়ংসেবকদের কারারুদ্ধ করা হয়। কিন্তু দীর্ঘ ছয় মাসেও কোনোভাবেই সঙ্ঘের প্রতি অভিযোগ প্রমাণিত করতে না পেরে অবশেষে ৭.০২.৪৯ তারিখে কেন্দ্রীয় সরকার এই বেআইনি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় এবং এতে সঙ্ঘ যে সম্পূর্ণ নির্দোষ তা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে যায়।

৫। **কাপুর কমিশনের অভিমত :** ১৯৬৬ সালে গান্ধী হত্যার পুনর্বিবেচনার জন্য কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার সুপ্রীমকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রী জে. এল. কাপুরের নেতৃত্বে ''কাপুর কমিশন'' নিয়োগ করে। এই কমিশনও ১০১ জনের সাক্ষ্য এবং ৪০টি নথি পরীক্ষা করে, ১৯৫৯ সালে তার রায় ঘোষণা করে : **''গান্ধীহত্যায় আরএসএস কোনোভাবেই যুক্ত ছিল না।''** (কাপুর কমিশন রিপোর্ট : ১ম খণ্ড : ১৮৬ পৃ.)।

৬। **প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে আমন্ত্রিত সঙ্ঘ :** ১৯৬২ সালে চীনা

আক্রমণের সময় সেকেন্ড লাইন অফ ডিফেন্স অর্থাৎ প্রতিরক্ষার দ্বিতীয় সারি হিসেবে সঙ্ঘ যে গুরুদায়িত্ব পালন করেছিল, তার স্বীকৃতি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু, ১৯৬৩ সালের প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করবার জন্য সঙ্ঘকে অনুরোধ জানান এবং মাত্র তিন দিনের নোটিশে ৩ হাজার গণবেশধারী স্বয়ংসেবকের একটি সুসজ্জিত বাহিনী নিয়ে সঙ্ঘ এতে অংশগ্রহণ করে। **একটি প্রকৃত অপরাধী এবং কলঙ্কিত সংগঠন কি এই ধরনের সরকারি স্বীকৃতি ও সম্মান লাভ করতে পারে?** রাহুল, বুদ্ধ, লালু, মুলায়মরা কি একথা জানেন? মনে হয় না এ বিষয়ে এঁদের এতদূর পর্যন্ত পড়াশুনো আছে।

৭। **গান্ধীজী সঙ্ঘের শত্রু নয়, প্রশংসক ছিলেন :** ১৯৩৪ সালে মহারাষ্ট্রের ওয়ার্ধা জেলার সঙ্ঘের শীতকালীন শিবির পরিদর্শনের জন্য গান্ধীজী আমন্ত্রিত হন এবং গভীর পর্যবেক্ষণের পর গান্ধীজী এই কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সঙ্ঘের এই স্মৃতি, গান্ধীজীকে এতটাই অভিভূত করেছিল যে এর প্রায় ১৩ বৎসর পরেও (১৬.০৯.৪৭ তারিখে অর্থাৎ স্বাধীনতা লাভের ১ মাস পর) দিল্লীর ভাঙ্গী কলোনিতে স্বয়ংসেবকদের প্রশংসা করেন এবং তাদের উদ্দেশে গান্ধীজী বলেন, "I visited RSS camp years ago, when the founder Shri Hedgewar was alive. I was very much impressed by your discipline. The complete absence of untouchability & rigorous simplicity. Since then the Sangh has grown. I am convinced that any organisation which is inspired by high ideal of Sevice & self Sacrifice, is found to grow in Strength. (The Hindu : 17.9.47)"

৮। **গান্ধীজীকে সঙ্ঘ আজও শ্রদ্ধা করে :** ভারতের বরেণ্য মনীষীদের নিয়ে সঙ্ঘ-রচিত "একাত্মতাস্তোত্রম্" সঙ্ঘস্থানে নিত্য উষাকালে সমবেতভাবে উচ্চারিত হয়ে থাকে। ৩৪টি শ্লোকযুক্ত এই একাত্মতাস্তোত্রমের ২৯ নং শ্লোকের (যথা— **"দাদাভাই গোপবন্ধু : তিলকো গান্ধিরাদৃতা** :"...) মাধ্যমে সারা ভারতের স্বয়ংসেবকগণ, অন্যান্য মনীষীদের সঙ্গে গান্ধীজীকেও নিত্য শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে থাকে। কোনো শত্রুর নাম, সঙ্ঘ কি তার প্রাতঃস্মরণীয়দের তালিকায় রাখবে?

৯। **ঘাতক নয় সঙ্ঘ ছিল গান্ধীজীর রক্ষক :** ১৯৪৬ সালের কোনো এক সময় দিল্লীর ভাঙ্গী কলোনিতে অবস্থাকালে বেশ কিছু মুসলিম গুণ্ডা গান্ধীজীর বাসগৃহ ঘেরাও করে, উত্তেজিত অবস্থায় অকথ্য ভাষায় গালাগাল করতে থাকে। এরপর সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকেরা গান্ধীজীর সুরক্ষার জন্য এগিয়ে আসেন এবং বেশ কয়েক সপ্তাহ যাবৎ তাঁরা গান্ধীজীর সুরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সুতরাং এতে প্রমাণিত হয় **সঙ্ঘঘাতক তো নয়ই, বরং গান্ধীজীর রক্ষক হিসাবেই তার মহান নৈতিক দায়িত্ব পালন করেছে।**

১০। **আসলে গান্ধীজীকে হত্যা করেছে ব্যক্তি নাথুরাম :** অনেকেই গায়ের জোরে সঙ্ঘকে কলঙ্কিত করতে গিয়ে প্রায়ই বলে থাকেন সঙ্ঘের আদর্শগত প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই নাকি নাথুরাম গান্ধীজীকে হত্যা করেছে। সঙ্ঘের উদ্দেশ্য রাষ্ট্রভক্ত, চরিত্রবান, শৃঙ্খলা-পরায়ণ আদর্শ মানুষ তৈরি করা। সাংগঠনিক স্তরে রয়েছে "তিরস্কার নয়, বহিষ্কার নয়, চাই সংস্কারমূলক নীতি। সঙ্ঘের সাফল্যের মূলমন্ত্র কি? "Intense Love is the basis of our Success" (Guruji) অর্থাৎ সুগভীর ভালবাসাই আমাদের সাফল্যের মূল ভিত্তি। এর মধ্যে কোথায় হত্যার মানসিকতা রয়েছে? সমগ্র সঙ্ঘ সাহিত্যে কোথাও একটিও সন্ত্রাসবাদী-মূলক শব্দ যে খুঁজে পাওয়া যাবে না এ কথা হলফ করেই বলা যায়।

আসলে , গান্ধীজীকে হত্যা করেছেন ব্যক্তি নাথুরামই। কিন্তু কেন নাথুরাম এরকম একজন 'মহাত্মাকে' হত্যা করতে গেলেন? গান্ধীজীর কি কোনো অপরাধই ছিল না? এসবের লিখিত জবাব আদালতে পেশ করেছিলেন নাথুরাম। তিনি ভারতবাসীকে জানাতে চেয়েছিলেন তাঁর ব্যথা বেদনা এবং বিচার বিশ্লেষণের কথা। কিন্তু এক গভীর রহস্যময় অজ্ঞাতকারণে তাঁর সেই 'বিবৃতি' দীর্ঘ ২৭ বৎসরেরও বেশি সময় যাবৎ সরকারি নিষেধাজ্ঞায় অপ্রকাশিত রাখা হয়েছিল। কিন্তু কেন? কিসের ভয়ে? গান্ধীজীকে তিনটি গুলি করেছিলেন নাথুরাম, তাঁর পিস্তলে আরও গুলি ছিল। কিন্তু তিনি আত্মহত্যা করেননি। আত্মগোপন করবার মতো পোষাকও পরেননি, পালাবারও চেষ্টা করেননি। সম্ভবত তিনি চেয়েছিলেন— আদালতে বিচারকালে, আত্মপক্ষ সমর্থনের সময় তিনি দেশবাসীকে সবিস্তারে তাঁর অন্তরের কথা জানাতে পারবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দীর্ঘদিন যাবৎ তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠ স্তব্ধ করে রাখা হয়েছিল, কোনো এক অজ্ঞাতকারণে। আজ অবশ্য "শুনুন ধর্মাবতার" গ্রন্থের মাধ্যমে সেই সত্য প্রকাশিত।

(লেখক রায়গঞ্জ কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক)

অর্থনীতির পুনরুদ্ধারে এক নতুন তত্ত্ব মোদীনমিক্স

কাঞ্চন গুপ্ত

বাস্তবে কেবলমাত্র হার্ভাডের ডিগ্রি বা 'পশুর মতো চরম তাড়না' থাকলেই ভারতের অর্থনীতির ঊর্ধ্বগতি সম্ভব নচেৎ নয়। দরকার সাধারণ জ্ঞান ও দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা। এই দুটোই রয়েছে নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীর মধ্যে। ভারতীয় অর্থনীতির এই ক্রম নিমজ্জমান পরিমণ্ডলে এটা ভাববার আজ সময় এসেছে যে হার্ভাডে পড়াশোনা করে অর্থনীতির চালকের আসনে বসলেই বা 'পাশবিক তাড়নায়' অর্থনীতির গতিপথ পাল্টানোর চেষ্টা করলেই যদি সুফল পাওয়া যেত তাহলে ভারতের এমন দুর্দশা হোত না। দেশের প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর তারস্বরে দেশবাসীকে বোঝানোর প্রয়োজন হোত না যে দেশের অর্থনৈতিক অধোগমনের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ দায়ী। দেশের এমন হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতিতেও আমাদের হার্ভাড ফেরত পণ্ডিত অর্থশাস্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ব্যঙ্গ করার নির্লজ্জতা সংবরণ করতে পারেননি। তাঁর বরাবরের মতো নানান কদর্য অভিধার মধ্যে সর্বশেষটি বেছে নেওয়া যায়। তিনি বলেছেন, মোদীর অর্থনৈতিক জ্ঞানের পরিধি একটি পোস্টেজ স্ট্যাম্পের পেছনে লিখে ফেলা যায়। এই ঘৃণ্য আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় মোদী মুখ-তোড় জবাব দিয়েছেন। সম্প্রতি দিল্লীতে ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত অর্থনীতিবিদ, বিশিষ্ট শিল্পপতি ও কূটনীতিবিদদের 'ইন্ডিয়া ইকনমিক কনভেনশন ২০১৪' শীর্ষক এক মহাগুরুত্বপূর্ণ সভায়। তিনি বলেন, তাঁর সম্পর্কে করা উক্তিটি ঠিক নয়। বাস্তবে তাঁর জ্ঞান ডাকটিকিটের পেছনে ধরানোর পক্ষেও কম।

নরেন্দ্র মোদী জনমোহিনী প্যাকেজ দেওয়ায় আদৌ বিশ্বাসী নন। এতে হয়ত সাময়িক ভোট আসতে পারে, কিন্তু আদতে অর্থব্যবস্থা ধ্বংসের মুখে পড়ে। তিনি এই সব ফাঁপা সাময়িক ডোল দেওয়ার প্রতিশ্রুতি কখনই দেন না। তিনি বিশ্বাস করেন শ্রমের মর্যাদায় ও মানুষের ক্ষমতায়নে।

সভাস্থলে উপস্থিত মান্যগণ্যদের মধ্যে মোদীর এই প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের অন্তরালে কি রয়েছে তার যথেষ্ট আন্দাজ ছিল। কেননা তাঁরা তো জানতেন যে দেশের এই মহাপণ্ডিত অর্থনীতির বাক্‌বিশারদ অর্থনৈতিক অধঃপতন থামাতেই শুধু ব্যর্থ নয়, তার গতিমুখও ঘোরাতে পারেননি। সেখানে নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্ব দিয়ে গুজরাট উন্নয়নের কাণ্ডারী হয়েছেন, দেশের কোষাগারে বিপুল করভাণ্ডার জমা করে অর্থনীতির নিমজ্জমান অবস্থার মধ্যে তাকে নিরন্তর রক্ত সরবরাহ করে চলেছেন। নিজ রাজ্যকে করে তুলেছেন সমৃদ্ধ। সেই তাঁকেই বিদ্রূপ করা এক ধরনের অপদার্থের আস্ফালন ছাড়া আর কি? কিন্তু চিদাম্বরমের এই ফাঁকা আওয়াজ হয়তো পরিচিত প্রচার মাধ্যমগুলিকে মুখরোচক চাটনি দিতে পারে কিন্তু বাস্তবে ২০০৪ সালে যে স্বাস্থ্যবান টগবগে অর্থনীতির উত্তরাধিকার তাঁর তথা কংগ্রেস দলের হাতে এসেছিল তাকে তিনি সম্পূর্ণ ভূলুণ্ঠিত করে গেলেন।

চিদাম্বরম ও মনমোহন

১৯৯১ থেকে ৯৬ সালে নরসীমা রাওয়ের সরকারে অর্থমন্ত্রী থাকাকালে দেশীয় অর্থনীতির সংস্কারের যে ব্যবস্থাগুলি নেওয়া হয়েছিল তা আদতে প্রধানমন্ত্রী নরসীমার বকলমেই গৃহীত। মান্ধাতার আমলের ব্যর্থ নেহরু মডেলকে পরিত্যাগ করতে যা ছিল নিতান্তই দরকারি। অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনে আই এম এফ (ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড)-এর বিপুল অনুদান এক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছিল। আর এই উদ্ধার প্রক্রিয়ার গৌরবের দাবিদার হয়েছিলেন অপাত্র মনমোহন। তিনি যে এর কোনোটারই যোগ্য নন তা আজকের ভারতের উন্নয়নের ধারাবাহিকতা ধ্বংস

করার মূল পাণ্ডা হিসেবে তিনি প্রমাণ করে ছেড়েছেন। ভুরি ভুরি অপকর্মের মাধ্যমে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন যে তিনি একজন মেরুদণ্ডহীন মানুষ যিনি ক্ষয়িষ্ণু নেহরু গান্ধী পরিবারের গোমস্তা হিসেবে চলতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। তাঁর আর একটি অক্ষয় কীর্তি হলো তাঁর নাকের ডগায় ঘটে চলা দেশ লুটের নিরবিচ্ছিন্ন কার্যকলাপ। পূর্ণমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, আধামন্ত্রী, আমলা যে পেরেছে সেই দুর্নীতির নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছে। তিনি নীরবে সব দেখেছেন আর ভান করেছেন কিছু না জানার। এমন একজন অক্ষম মানুষ যে নতুন চিন্তাভাবনা দিয়ে অর্থনীতিতে নতুন জোয়ার আনবেন এমনটা ভাবাই ধৃষ্টতা।

মোদীর রূপরেখা

সম্প্রতি দিল্লীর তিনটি ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠানে মোদী ঘোষণা করেছেন যে দেশীয় অর্থনীতির এই চরম নেতিবাচক অবস্থান থেকে পরিত্রাণ পেতে সময় পরীক্ষিত প্রাচীন রীতির সাধারণ জ্ঞান ও রাজনৈতিক দৃঢ়তাই একমাত্র দাওয়াই। হ্যাঁ, এখন এটা ঠিক যে নেহরু গান্ধী পরিবারের উচ্চ ভাবধারার বাতিল ধ্যান ধারণাগুলিকে আশ্রয় করেই যারা বেঁচে আছেন তাঁদের মনঃপুত হবে না। তাঁরা সোনিয়া গান্ধীর ন্যাশনাল অ্যাডভাইসারি কাউন্সিলের দেওয়া ভুতুড়ে প্রেসক্রিপসন বাজারে ফেরি করতেই বেশি দড়। অর্থনৈতিক পঙ্গুত্বের প্রভাবে মৃতপ্রায় দেশবাসীকে সোনিয়াজীর ভোটের ডোল মৃতসঞ্জীবনী দিয়ে দীর্ঘজীবী করবে— এই আশায় তাঁরা বিভোর। এর মধ্যে আবার হঠাৎ ফুঁসে ওঠার মতো মনমোহন সিংহের মাঝে মধ্যে গান্ধী পরিবারের শেকল ছিঁড়ে তথাকথিত বাঁধা গতের (box thinking) থেকে বেরিয়ে আসার ছটফটানি শোনা গেছে। তবে যখন তিনি (animal spirit) নিয়ে অর্থনৈতিক সংস্কারের অসার আস্ফালন করলেন তখন দেখা গেল তাঁর তাড়না (spirit) হয়ত রয়েছে কিন্তু ঘনায়মান অর্থনৈতিক অন্ধকার কাটাতে শরীরের পেশীগুলি আর সক্ষম নয়।

চলতি পথ ছেড়ে বেরোনোর ভাবনা, চরম পথের পথিক হওয়া, বড় ক্যানভাসের পরিসরে অর্থনীতিকে স্থাপনের স্বপ্ন, শুধু আজ আর আগামীকালের পরিধিকে অতিক্রম করে দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তনের দিশারী হতে গেলে লাগবে সেই দুটি অত্যাবশ্যকীয়— (১) সাধারণ জ্ঞান এবং (২) দায়বদ্ধতা। অবশ্য একে যদি রাজনৈতিক প্রতিজ্ঞাবদ্ধতা বলতে চান তাও বলতে পারেন। শাসন কথাটি বোঝাতে গিয়ে মোদী যখন ব্যাখ্যা করেন যে এটি কোনো মহাকাশযান উৎক্ষেপণের কৃৎকৌশল নয়, কেবলমাত্র উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের স্বচ্ছতার সঙ্গে সঙ্গে কাজের প্রতি অকৃপণ নিষ্ঠা যে কথা মানুষ বিশ্বাস করে। কারণ তিনি ঠিক কথাই বলছেন। তাই এগুলি ঠিকঠাক থাকলেই স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী যে কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনাই গ্রহণ করা হোক না কেন তার সাফল্য অনিবার্য। বারবার ঢাক পিটিয়ে বিনিয়োগকারীদের আস্থা না বাড়ালে পুঁজি আনা যাবে না এসব বলা খুব জরুরি নয়। সেই পরিবেশ সেই আস্থা অর্জন করতে গেলে প্রাথমিক শর্ত সুশাসন প্রবর্তন করা। প্রয়োজন রাজনৈতিক নেতৃত্বের দুরদৃষ্টি। কেবলমাত্র হরেক কিসিমের দান-ধ্যানকেন্দ্রিক প্রকল্প চালু করে দেশের টাকার অপচয় হতে পারে, কোনো সমস্যার দীর্ঘমেয়াদী সুরাহা যে হয় না তা তো দশ বছরের নিষ্ফলা ইউপিএ-২ শাসনকালে দেখেছি।

এই প্রেক্ষাপটে নরেন্দ্র মোদী যখন পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিনিয়োগ, শিল্প ক্ষেত্রের উৎপাদনে পুনরুজ্জীবন, কৃষিক্ষেত্রের ওপর যথাযথ নজর দেওয়া শুধু নয়— এই সবগুলি ক্ষেত্রেই সর্বাধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন তখন কিন্তু একেবারে মৌলিকভাবে নতুন কিছুই বলেন না। বছরে ১ কোটি কর্মহীনকে কাজ দিতে গেলে এসব ছাড়া তো গতি নেই। তাহলে তুমুল হট্টগোলের মধ্যে এই নিদান নিয়ে সকলকে ছাপিয়ে শুধু তাঁর কথাই লোকে কেন শুনছে? শুনছে কেননা তাঁর বলার মধ্যে রয়েছে আন্তরিকতা আর আত্মবিশ্বাস। সেই সঙ্গে যোগ হয়েছে গুজরাটে তাঁর হাতে কলমে অভিজ্ঞতার বাস্তব উদাহরণগুলি। নরেন্দ্র মোদী জনমোহিনী প্যাকেজ দেওয়ায় আদৌ বিশ্বাসী নন। এতে হয়ত সাময়িক ভোট আসতে পারে, কিন্তু আদতে অর্থব্যবস্থা ধ্বংসের মুখে পড়ে। তিনি এই সব ফাঁপা সাময়িক ডোল দেওয়ার প্রতিশ্রুতি কখনই দেন না। তিনি বিশ্বাস করেন শ্রমের মর্যাদায় ও মানুষের ক্ষমতায়নে। তিনি ব্যাঙ্কের নীতির মতো সম্পদ তৈরি (asset creation) করাতে চান। আজকের তরুণ ভারতের ছোট বড় উদ্যোগপতিদের (entreprener) উচ্চাশা, আশংকা যাতে সঠিক দিশায় চরিতার্থ হয়— এই কাজে তিনি সদা-সচেষ্ট।

বিরোধিতা

অনেকেই তর্ক জুড়ে দেন এই ভোটের বাজারে ভারতীয় কোম্পানিগুলির আন্তর্জাতিক বাজারে নেমে পড়ে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হওয়া মোটেই কাম্য নয়। উদাহরণ স্বরূপ তাঁরা আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় প্রায়শই এই বিদেশী পণ্যের প্রতিযোগিতার প্রসঙ্গ তুলে প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার বিরোধিতার কথা উল্লেখ করেন। দলমত নির্বিশেষে সকলেই তখন বিদেশী আমদানির বিপক্ষে চলে যান। পণ্ডিতরা বলেন, এই পদ্ধতি আসলে অনেক নিরাপদ। বরাবরের অবলম্বিত পন্থা তাই ঝুঁকিবিহীন। মোদী এই চিরাচরিত পন্থাকেই ঘাড় ধরে উল্টোমুখে ঘুরিয়ে দিতে চান। তিনি চান ছোট বড় নির্বিশেষে সব ভারতীয় কোম্পানিগুলিকেই বিদেশী প্রতিযোগিতার বাজারে সমান তালে লড়ে যেতে। তাই তিনি জোর দেন দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের ওপরে। ডাক দেন সীমিত পরিধির বাইরে হাত বাড়াতে। চ্যালেঞ্জকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করার মন্ত্র তিনি দিয়ে চলেছেন। ভবিষ্যতের কূটনীতিক কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমাদের দেশের ব্যবসা বাণিজ্য অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত দেশগুলির আপাত সম্পর্কই এক বিরাট ভূমিকা নিতে পারে এটাই তাঁর বিশ্বাস।

সেই মানুষটি যাঁর অর্থনীতির জ্ঞানভাণ্ডার কেবলমাত্র একটি ডাক টিকিটের পরিধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ, ভাবতে অবাক লাগে তিনি কেমন অবলীলায় পরবর্তী

প্রজন্মের প্রযুক্তি, জৈবপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিপুল বিনিয়োগ, পরিবেশগত প্রযুক্তির বিকাশের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের কথা বিশ্বাসযোগ্য সরলতায় বলে যান। আর তখনই মনে হয় সেই নিদারুণ অপদার্থগুলির নির্লজ্জ উক্তিগুলি নিতান্তই বাস্তববোধহীন। তাই মনে হয় নরেন্দ্র মোদী ছোট পর্দার সিনেমায় বিশ্বাসী নন। তিনি চান বিশাল দিগন্ত। তার ছোটখাট কূটকাচালি নিয়ে তিনি মাথা ঘামান না। এক বিশাল মাপের মেশিন যিনি উদ্ভাবন করছেন তাতে কটা নাট-বল্টু লাগবে এ দেখা তাঁর কাজ নয়। এগুলি করবেন প্রকল্পের রূপায়ণের কাজকর্ম দেখার কর্মীরা। যিনি চেনা ছকের বাইরে ভাবছেন তিনি বিশাল মাপের চিন্তক। তাই তো হওয়া উচিত। একজন প্রধানমন্ত্রীই তো রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ রূপরেখা তৈরি করবেন। তিনিই লক্ষ্য স্থির করবেন কাজের লক্ষ্যমাত্র নির্ধারণ থেকে সময়সীমা বেঁধে দেবেন।

হাতে কলমে প্রমাণ চাইলে ১৯.১.২০১৩'র বিজেপি-র জাতীয় কর্মসমিতির সম্মেলনে দেওয়া তাঁর ভাষণটি স্মরণ করুন। (১) দেশের মধ্যে অপ্রতিরোধ্য গ্রাস থেকে শহরে আসার স্বাভাবিক প্রবণতাকে প্রাধান্য দিয়ে অন্তত ১০০টি নতুন শহর তৈরি।

(২) সুপার ফাস্ট ট্রেনের আরও বেশি প্রচলন যাতে থাকবে নির্দিষ্ট করিডর।

(৩) অতি উন্নত হাইওয়ে ও এক্সপ্রেস ওয়ে।

(৪) উচ্চ প্রযুক্তি চালিত উচ্চফলনশীল কৃষি ব্যবস্থা। এমনই সব বড় ক্যানভাসের প্রকল্প যেগুলি অবশ্যই করে দেখানো যায়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে অনেকেই বিদ্রূপ করবেন এসব গালভরা কথার টাকা কোথা থেকে আসবে? এ প্রশ্নের উত্তরও সোজা। একবার যদি বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জন করা যায় আর অর্থনীতির পতন আটকে তার অভিমুখ ঘোরানো যায় তাহলেই দেখা দেবে রূপালী রেখা। শুরু হবে আবার নতুন ভারতের গল্প। সারা বিশ্বের নজর তখন সেদিকেই পড়বে। দয়া করে ভুলে যাবেন না বিজেপি পরিচালিত এনডিএ পোখরানে পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটানোর পর যে অর্থনৈতিক অবরোধের মুখে পড়েছিল তার পরেও সরকার অনায়াসে মূলধন সংগ্রহ করে অনেক বড় মাপের পরিকল্পনার সার্থকরূপ দিতে পেরেছিল। হ্যাঁ, প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীও তাঁর ভাবনার পরিসরে ছোটখাট পরিহার্য জিনিসকে পাত্তা দেননি। দৃষ্টি, সঙ্কল্প নিবদ্ধ রেখেছিলেন বিশাল ভাবনার সফল রূপায়ণের ওপর। অনেক কিছুই দেশে ঘটেছিল। আপনারা জানেন। তেমনই দেশের পক্ষে চমকপ্রদ মঙ্গলজনক অনেক কিছুই অপেক্ষমান। একবার নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রীর হালটা ধরতে দিন।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

PIONEER®
নিখুঁত লেখার খাতা
প্রতি পৃষ্ঠায় PAGE NO. DATE এর ঘর।
পাইওনিয়ার পূর্ব ভারতের সর্বাধিক বিক্রিত খাতা।
আদর্শ বাঁধাই ও সুন্দর সাইজ।
ভাল হাতের লেখার জন্য মসৃণ Creamwove & D.T.P.P. কাগজ ব্যবহার করা হয়।
প্রতিটি খাতায় সঠিক মার্জিন এবং লাইনিং। সর্বোত্তম গুণমান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী।
ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড নির্দেশিত IS: 5195-1969 নির্দেশিকা কঠোর ভাবে পালন করার প্রয়াস।
প্রতি পৃষ্ঠায় Teacher's Signature..... কলাম।
PIONEER®
সঠিক গুণমানই আমাদের পরিচয়
PIONEER PAPER CO.
Off: 4a, Jackson Lane(1st floor)
Kolkata-1. Ph:350-4152, 353-0556
Fax:91-33-353-2596.
E-Mail:pioneer3@vsnl.net

নেত্রদান মহাদান
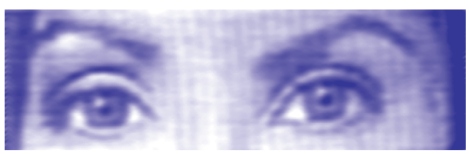
EYE BANK
23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451
অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387
সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

অর্থনীতি উদ্ধারে কোনও রকেট বিজ্ঞানের প্রয়োজন নেই

অশোক মালিক

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি (২০১৪) দিল্লীতে নরেন্দ্র মোদী তিনটি ভাষণ দেন মূলত অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গের কাছে। এঁদের মধ্যে ছিলেন বাণিজ্যিক অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টটেন্ট, ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার কাজে যুক্ত উচ্চ পদাধিকারীরা। "ইন্ডিয়া ইকোনমিক কনভেনশন, ২০১৪" নামে অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিল ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন। ওই ভাষণের শ্রোতারা অভিভূত ও আমোদিত। এই ভাষণগুলির জন্যে, বিশেষিত অর্থনীতি সম্পর্কিত ভাষণগুলি সম্পর্কে মিডিয়া ছিল দারুণভাবে উৎসাহিত। তাঁরা উৎসুক ছিলেন নরেন্দ্র মোদী কীভাবে তাঁর আর্থিক দিশা ব্যক্ত করেন, নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের বিষয়গুলি কি এবং আর্থিক দুরবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্য তিনি কি 'রোডম্যাপ' তৈরি করেন তা দেখার জন্য।

এই সমাবেশগুলির শ্রোতাদের বেশিরভাগই অর্থনৈতিক পণ্ডিত এবং রাজধানীর মিডিয়া গুরু। তাঁদের এমনটাই বিশ্বাস ছিল যে যদি তাঁরা এই সভাগুলির বক্তব্য তখনই জানাতে না পারেন তাহলে তার গুরুত্ব থাকবে না। প্রকৃত অর্থে বিজেপি-র জাতীয় পর্ষদের সভায় গত ১৯ জানুয়ারি মোদী যে বক্তব্য পেশ করেন সেখানেই তিনি তাঁর আর্থিক দিশা ব্যক্ত করেন। সেসময় এই বক্তব্যকে মিডিয়া যথাযথভাবে তুলে ধরেনি। মনে হয় মিডিয়ার লোকজন সেই বক্তব্য ঠিকভাবে শোনেনি বা ব্যাখ্যা করেনি। এর ফলে পরের দিনই কেজরিওয়াল দিল্লীতে ধর্নায় বসেন এবং মিডিয়ার সার্কাস শুরু হয়ে যায় সেখানে।

আসলে বিজেপি-র অন্দরমহলের ব্যক্তিরা ২৭ ফেব্রুয়ারির অনেক আগেই জানিয়ে রাখেন যে, মিডিয়ার জন্য মোদীর চমকদার ফাটাফাটি বক্তব্য অপেক্ষা করছে। মিডিয়া যদি বিষয়টাকে তেমন গুরুত্ব না দেয় তাহলে মোদী বা অন্য কেউ কীভাবে বলবেন যে, এই সমাবেশ এক বৃহৎ সমাবেশ? অবশ্যই আমাদের সামনে অপেক্ষা করছে পূর্ব-পরিকল্পিত এক বড় ভাষণ। যদি এটা ২৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত না হয় তবে তা পরে কোনও এক দিনে অনুষ্ঠিত হতে পারে— কিন্তু না, তা কোনোভাবে হবে না যাতে মিডিয়া এই সমাবেশের গুরুত্ব বুঝতে ব্যর্থ হয়।

যদি এটা রসিকতা হয়ে থাকে তবুও তা সত্যসত্যই অভিভূত করার মতো বিষয়। নির্বাচনের মাত্র কয়েকমাস আগে নীতি বিষয়ক কিছু ঘোষণা কেবল বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে শুধু নয় বরং তা প্রতিকূল পরিস্থিতি তৈরি করবে। এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই যে মোদী-ই জিতবেন। জনতার রায় কী হবে তার যখন কোনো নিশ্চয়তা নেই, তখন এখানে পোড় খাওয়া, ঝানু রাজনীতিকের পক্ষে নীতি ঘোষণা ঠিক কাজ হবে না।

এছাড়া এবারের রাজনীতির লড়াইয়ের অভিমুখ হবে ইউপিএ সরকারের কার্যকারিতা এবং তার রেকর্ডের ওপর— আর মোদী ও তাঁর দল তা নিয়েই সোচ্চার। সুতরাং এটা বিজেপি-র পক্ষে আত্মহত্যার সামিল হবে মোদী যদি এখনই তাঁর নীতি এবং ম্যাক্রোইকনমির কৌশল ব্যক্ত করে দেয়। আর সেটাই কংগ্রেসকে হাতিয়ার করার সুযোগ এনে দেবে। এছাড়া নীতি ঘোষণার ফলে কিছু লোক খুশি হবেন আবার কিছু লোক অখুশি হবেন। তাহলে শুধু শুধু নির্বাচিত হবার আগেই কংগ্রেসের টার্গেট হতে যাবেন? তিনি আর যাই হোক, অন্তত নির্বোধ নন।

মোদী ২৭ ফেব্রুয়ারি বা তার আগের বক্তৃতায় ঠারে-ঠোরে বুঝিয়েছেন তাঁর লক্ষ্য ও অগ্রাধিকারের তালিকায় কি রয়েছে। তিনি ব্যবসায়ীদের কাছে জনপ্রিয়ও হতে পারেন কিংবা অপ্রিয়। তিনি তাদের নৈতিক সাহস যুগিয়েছেন এবং 'পরিবর্তনশীল বিশ্ব'-র উপর নজর রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। যদি কেউ ভেবে থাকেন নির্বাচনের প্রাক্কালে তিনি আরও কিছু বিস্তারিতভাবে বলবেন তবে তা হবে আশার অতীত। তাঁর ভাষণে সংকেত রয়েছে ক্ষমতাসীন হলে বড় বড় সড়ক, রেলপথ এবং নগরায়নের দিকে নজর দেবেন, আরও সংকেত রয়েছে সরকারি খরচ বৃদ্ধি করবেন অর্থনীতিতে চাহিদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে— তাঁর মনের কোণে এসব চিন্তার উদ্রেক হচ্ছে।

অনেকেই প্রশ্ন তুলবেন যে এর জন্য পর্যাপ্ত অর্থের জোগান হবে কীভাবে? যদিও এরা জানে যে যদি সদিচ্ছা এবং নীতির স্বচ্ছতা থাকে তবে অর্থের অভাব হবে না। প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী এমন এক ব্যক্তির কাছে আর কি প্রশ্ন থাকতে পারে? যাঁরা তাঁর কাছে তাঁর 'ভিশন' বা দিশা নিয়ে প্রশ্ন করবেন, তার জবাবে মোদী অবশ্যই ভারতীয় অর্থব্যবস্থার তিনটি দিকের ওপর জোর দেবেন এবং সেগুলি হলো— গণতন্ত্র, জনসংখ্যা এবং চাহিদা। তিনি বলেছেন যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অতটা গুরুতর বিষয় না হলেও গণতন্ত্র হলো এক সহায়ক পন্থা। লক্ষ্য করুন, তিনটি দিকের ওপর নজর রেখেছেন মোদী। এর মধ্যে রয়েছে অভ্যন্তরীণ চাহিদার কথা যা

কিনা চৈনিক অর্থনীতিতে অনুপস্থিত। চৈনিক অর্থনীতি মূলত বৈদেশিক রপ্তানির ওপর নির্ভরশীল।

দিল্লীর পেশাগত পণ্ডিতরা এতে খুশি নন। তাঁরা চান মোদী এখনই তাঁর আস্তিনে গুটিয়ে রাখা অর্থনীতির ওপর তাঁর মনের কথা এখনই বিস্তারিত হবে খোলাখুলি বলুন। মোদীর কাছ থেকে তাঁদের সন্তোষজনক উত্তর না পেয়ে তাঁরা একপ্রকার অধৈর্য হয়ে পড়েছেন। মোদীকে তাঁরা বলেছেন, এখনই ভারতের দরকার নির্মাণ শিল্পের উন্নয়নের কথা। আগামী কুড়ি বছর ধরে প্রতি মাসে দশ লক্ষ যুবক-যুবতী কর্মক্ষম হবে। এই বিপুল সংখ্যাকে নিয়োজিত করা যাবে না কেবল মহাত্মা গান্ধী গ্রাম কর্মসংস্থা যোজনায়। এদের জন্য চাই বিপুল পরিকাঠামো উন্নয়ন। ভারতের চাই বৃহৎনগর, ব্যাপক শিক্ষা ব্যবস্থা, ভারতের কৃষির ব্যাপক উন্নতি। সেই সঙ্গে কারিগরি শিক্ষা, জৈবিক কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক উন্নয়ন। আর চাই বিশ্ববাণিজ্যের দরজা দরাজ হাতে খুলে দেওয়া যাতে বিভিন্ন সেক্টরে বিপুল আকারে আসে বিদেশী নিয়োগকারীদের অর্থ।

মোদী নিজে এইসব আর্থিক সমাবেশে বলেছেন যে, এসব উপলব্ধি করতে কোনও 'রকেট বিজ্ঞান' তাঁর জানা নেই, স্পষ্টত মনমোহনের তালিকায় এসবই ছিল। বিষয়টা সকলেরই জানা বিষয় এবং এর সমাধানও সবাই জানে, তবে কীভাবে দক্ষ হস্তে তা কার্যকর করতে হবে সেটা জানা নেই। এসব রূপায়ণ করতে প্রয়োজন নীতি-স্বচ্ছতা, চাই জনতার অর্থ ব্যয়ে বিশ্বাসযোগ্যতা, চাই দেশের সম্পদের (বিশেষত প্রাকৃতিক সম্পদ) সঠিক ব্যবহার এবং সেই সঙ্গে নীতি গ্রহণ ও রূপায়ণে দ্রুততা। কিছু সিদ্ধান্ত হয়ত সঠিক নয়, তবুও এক নির্বাচিত সরকারকে ঝুঁকি নিতেই হবে কেননা এজন্যই তারা সরকারে আছে।

অন্য একটি প্রসঙ্গে মোদী বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কথা বলেছেন। পৌরসভা, পঞ্চায়েত থেকে প্রধানমন্ত্রী স্তর অবধি নেতাদের চাই 'দম'। এই হিন্দি শব্দটির অভিধানিক অর্থ হলো সৎ সাহস, প্রতিজ্ঞা, দক্ষতা এবং নিছক সাধারণ জ্ঞান ও দূরদর্শিতা। মোদী এইসব গুণাবলীর পক্ষে সওয়াল করেছেন। তিনি শপথ করেছেন যে, তাঁর গঠিত সরকার স্বজনপোষণে নিবিষ্ট থাকবে না, অথবা কোনো পরিবারকে সমৃদ্ধ করবে না কিংবা কারুর ভগ্নী বা পত্নীকে ধনশালী করবে না। তাঁর স্বগতোক্তি যে, তাঁর সরকার নির্বাচিত হলে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেবে এবং কাজে ভুলচুক হলে তা যেন সন্দেহের চোখে না দেখে ক্ষমার চোখে, অন্য ভাষায় বিশ্বাসের চোখে দেখা হয়।

তাহলে কি মোদী জিতবেন এবং নিজের কথাগুলিকে কাজে পরিণত করবেন? কেবল ভবিষ্যত-ই তা বলতে পারবে। তবুও প্রয়োজনীয় বিষয় হলো যা তিনি বললেন তা একান্তই আপেক্ষিক। ভারতের অর্থনীতির মূলে রয়েছে ভারতের রাজনীতি। নির্বাচন করুন সরকার এবং তাহলেই অর্থনীতি নিজের পথে চলবে। এবং স্ব-মহিমায় চলবে। ***(লেখক রাজনৈতিক ভাষ্যকার)***

মোদী ফর পি এম

মিশন ২৭২+

মুসলীম ভাগীদারী

সৌজন্যে : মুসলীম রাষ্ট্রীয় মঞ্চ

এনামুল হক

আহ্বায়ক

মুসলীম রাষ্ট্রীয় মঞ্চ, পশ্চিমবঙ্গ

মোঃ -০৯৭৩৫১৮২৬৮৫

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

কেন মোদী ?

হাফিজ ইব্রাহিম

ভারতে এর আগে পনেরবার নির্বাচন হয়ে গেছে। ২০১৪ সালে ষোলবারের নির্বাচন। আগের নির্বাচনগুলিতে যা দেখা যায়নি এবার সেটি হাস্যকর ভাবে দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর আসনের জন্য উমেদার অনেক। হাস্যকর বলছি এজন্য যে একশো কুড়ি কোটি জনসংখ্যার দেশে দশ বা বিশ কোটি নাগরিকের প্রাদেশিক নেতৃত্ব প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্নে মশগুল। অবশ্য একথা ঠিক যে এবারের নির্বাচন এমন একটা পরিবেশে হচ্ছে যাতে প্রত্যেকের মনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। তবু ভারতীয় জনসাধারণ সম্ভবত এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করবে। মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে এই সব স্বপ্ন দেখা প্রধানমন্ত্রীদের কথা একটু বলে নেওয়া দরকার। যাঁরা এ বিষয়ে স্বপ্ন দেখছেন তাঁদের মধ্যে প্রধান পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, বিহারের লালু প্রসাদ, দক্ষিণের জয়ললিতা এঁদের নামই বেশি শোনা যাচ্ছে। আসলে নিজেদের গুণ বা দক্ষতার জন্য নয়, এঁরা অঙ্কের খেলায় বাজিমাত করতে চান। ২৭২-এর বেশি হলে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হবে। যাদের হবে তারাই গড়বে সরকার। কংগ্রেস বা বিজেপি যদি এই সংখ্যায় পৌঁছতে না পারে তা হলে সরকার গড়তে এই প্রাদেশিক দলগুলির সাহায্য নিতে হবে। তখন অভীষ্ট পূরণের চেষ্টা করা যেতে পারে। এই অঙ্কের খেলা দেশের পক্ষে মারাত্মক। প্রাদেশিক নেতৃত্ব প্রদেশের সমর্থনে পুষ্ট। বিশেষ আবহে অথবা প্রদেশের প্রয়োজনে তাদের নেতৃত্ব কার্যকর হয়তো হয়েছে। কিন্তু সর্বভারতীয় সমস্যা বা প্রয়োজনের সামূহিক জ্ঞান ওঁদের নিতান্ত অভাব। তা ছাড়া প্রদেশকে বিশেষ ভাবে দেখতে গিয়ে সমগ্র দেশের বৃহত্তর স্বার্থের ক্ষতি হতে পারে। এসব কারণে জনগণের উচিত প্রাদেশিকতা বর্জন করে সংবিধান অনুসারে ভারতীয় গণতন্ত্রকে বলিষ্ঠ করা।

ভারতীয় গণতন্ত্রে জনসাধারণ কথা বলে দলের মুখ দিয়ে। তাই যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ হয় তারাই সরকার গঠন করে। সর্বভারতীয় দল বলতে মূলতঃ দুটি— বিজেপি এবং কংগ্রেস। ২০১৪-এর নির্বাচনে বিজেপি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সমর্থন করছে। আর কংগ্রেস তুলে ধরেছে রাজীব-সোনিয়া পুত্র রাহুল গান্ধীকে। আগে যে সংখ্যার খেলার কথা বলা হয়েছে প্রধানত এই দুটি দলের মধ্যেই এই খেলা সীমাবদ্ধ থাকবে। এই দুই দলের মধ্যে মানুষ কোনো একটি দলকে সমর্থন করবে আশা করা যায়। এবার দেখা যাক এ দুটি দলের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতা কার বেশি। এ প্রসঙ্গে স্কুলে পড়ার সময় কোনো অসামাজিক কাজ বা গণ্ডগোল দেখলে বলতাম কেলেংকেরিয়াস ব্যাপার। এই বৃদ্ধ বয়সে নুতন করে সেই কথাটি মনে এল— কেলেংকেরিয়াস কংগ্রেস। বিগত বছরগুলিতে ছোটখাট কেলেঙ্কারি কত হয়েছে তার হিসাব নেই। যে যে কেলেংকারিগুলি বাতাসে এখনও ভেসে বেড়াচ্ছে তার সংখ্যা কম নয়। বোফর্স থেকে শুরু করে কমনওয়েলথ গেমস, মোবাইল সংক্রান্ত ২-জি স্পেকট্রাম, কোলব্লক বন্টন ইত্যাদি ইত্যাদি। এর কোনো সুরাহা হয়নি। তাঁরাই এবারও নির্বাচনে জনপ্রতিনিধিত্ব দেওয়ার আবেদন জানাবেন। ভেবে দেখার মতো ব্যাপার হবে ওঁরা যদি ফিরে আসেন, সগর্বে বলবেন ও কিস্‌সু না। দেশকে আরও বড় কেলেঙ্কারির মধ্যে পড়তে হবে। এই সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে সর্বভারতীয় দল বলে দাবি করলেও নেতাদের মেরুদণ্ড সোনিয়া গান্ধীর কাছে বন্ধক দেওয়া আছে। অন্যদিকে নেহরু ইন্দিরা রাজীব আর প্রচ্ছন্ন ভাবে সোনিয়া প্রধানমন্ত্রিত্ব করে আসছে। এবার স্বপ্ন দেখছে রাহুল। পরিবারতন্ত্রের ধারা চলেই আসছে। অনেকে একথায় ক্ষুব্ধ হতে পারেন—বলতে পারেন লালবাহাদুর, চৌধুরি চরণ সিং, নরসীমা রাও, বাজপেয়ী এঁরা তো ছিলেন। অস্বীকার করার উপায় নাই কিন্তু স্বীকার করে নেওয়া ভাল যে এঁদের সময়টা কেবল শূন্য স্থান পূরণের জন্য।

বাকি রইল বিজেপি। সর্বভারতীয় দল এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক থেকে লক্ষণীয় ভাবে উজ্জ্বল হলেও এর নামে একটি কালিমা চিহ্ন এঁকে দেওয়া হয়েছে--- সাম্প্রদায়িকতা, যা প্রতিপক্ষ দলগুলির বহুল প্রচারের ফলশ্রুতি। সত্যিই কি তাই? বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ যে হিন্দুত্বের কথা বলেন সে হিন্দু ধর্ম কখনও সাম্প্রদায়িক হতে পারে না। মানুষের ধর্ম তার নিজস্ব জিনিস যা তাকে পশুত্ব থেকে দূরে রাখে। সংকীর্ণ মন নিয়ে হিন্দুধর্ম বিচার করলে জাত পাত এসে পড়ে। তাছাড়া ভারতীয় জনতা পার্টির শব্দগুলির মধ্যে কোনটি সাম্প্রদায়িক? মুসলিমলীগ যে নিছক ধর্মীয় নামাবলী গায়ে দিয়ে আছে, তাকে এত কুৎসা শুনতে হয় না। ইসলাম আশ্রয় করে যারা আছে, সব সময় তাদের দ্বৈত শাসন চালু আছে। একটি প্রশাসনিক শাসন, অন্যটি ফতোয়া শাসন। অতি অল্প সংখ্যক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মধ্বজীরা এই ফতোয়া নিয়ে বেড়াচ্ছেন। বিজেপি তেমনটি কখনও করেনি। ফতোয়া না মানলে কি হয় তসলিমা নাসরিন সলমনরুশদি তার বড় প্রমাণ। অযোধ্যার রামমন্দির এখানে না বলা ভাল। তবুও একটি কথা বলা যায় কবে কোনো যুগে কি হয়েছিল সেকথা ছেড়ে দিয়ে রামলালার অবস্থান এবং পূজাপাঠের প্রচলন তো দীর্ঘদিন চলে আসছে। সেটাকে যদি সংস্কার করা হয়, অপরাধ কোথায় বোঝা মুস্কিল। এখনও তো

রামলালারই পূজা হচ্ছে। বেশি আলোচনার প্রয়োজন নাই। গণতন্ত্রে যেটা সব থেকে বেশি প্রয়োজন তার গ্রহণযোগ্যতা এবং দলের কার্যসূচি পরবর্তীকালে পরিকল্পনা। সবার উপরে দল গঠনে ব্যক্তি তন্ত্রের বিষাক্ত প্রভাব এর নেই। শেষে বলি যদি বিজেপি-কে সাম্প্রদায়িক বলা হয় তবে কংগ্রেসই তার গোড়াপত্তন করেছে। যদি সব মানুষই ভারতীয়, সবার সমান দাম হয় তবে সংখ্যালঘু (বিশেষতঃ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে) ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাম দিয়ে বিভাজনের কি প্রয়োজন ছিল। মুসলমানকে হাতে রাখার জন্যই কংগ্রেসের এই সর্বনাশা খেলা স্বাধীনতার সময় থেকেই চলছে। এত সমালোচনাতেও বিজেপি-র শক্তি কমেনি বরং বাড়ছে।

এই শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের নির্বাচিত প্রধান প্রশাসক হবেন নরেন্দ্র মোদী। প্রার্থীপদ ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণভাবে গুজরাটের দাঙ্গার কর্তা বলে, মোদী কেন? প্রশ্ন উঠেছে। এই প্রশ্ন দুভাবে করা যেতে পারে— মোদী কেন? আর কেউ ছিল না? অন্য দিকে কেন মোদীকেই চাই। ভারতীয় জনতাপার্টি একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ দল গণতান্ত্রিক উপায়ে তাদের প্রশাসনের নেতা ঠিক করেছে।

নেতা হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর গায়ে গুজরাট দাঙ্গার দাগ আছে। এজন্য অনেকে তাঁকে দক্ষ প্রশাসক জেনেও তাঁকে পছন্দ করতে চান না। এই ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশও কিছু কিছু আছে, যেমন দাঙ্গা হয়েছিল ২০০২ সালে সব দাঙ্গার পরিণতি যা হয়— এও তেমনি। দাঙ্গা থেমেছে, দুর্গতারা যথাসম্ভব সুবিধা পেয়েছেন। দিন কেটে গেল। ২০০৭ সালে তেহেলকার সম্পাদক তেজপাল দাবি জানালেন নরেন্দ্র মোদী সহ বড় বড় নেতা যুক্ত ছিলেন এই দাঙ্গায়। শুধু স্মরণ রাখুন ঘটনার পাঁচ বছর পরে তেহেলকা তার বিশস্ত ভিডিও ক্লিপিং সংগ্রহ করে প্রচার করে। পুরো পাঁচ বছর কেটে গেছে তার উপাদান যোগাড় করতে। ভিডিও ক্লিপিং যে কি জিনিস এই সেদিন শোনা গেল ওবামা ভিডিও ক্লিপিং-এর ঘটনায়। মোট কথা বিজেপি-কে বলতে হবে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির আসর থেকে মোদীকে নির্বাসিত করা হোক।

এবার যদি বলা যায় মোদী একজন দক্ষ প্রশাসক, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পরিকল্পনার বাস্তবায়নে সমর্থ। নিজ রাজ্যে শান্তি স্থাপন ছাড়া ব্যবসা শিল্প শিক্ষা কোনোটাই গুজরাটে কম করেননি। আরও বড় কথা মোদীর প্রতিপক্ষ বলে, ভাল বক্তা, পরিশ্রমী। অতএব নিঃসন্দেহে বলা যায় মোদী ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর দৌড়ে মাঠে আর কেউ নেই।

আরও মজার কথা সাম্প্রদায়িক বলে এর জন্য গুজরাটে কটা দাঙ্গা হয়েছে। তার জায়গায় মুলায়ম অখিলেশ ওরা সাম্প্রদায়িক।

সর্বশেষ কথা মোদীর মতো ভারতের মাটিকে আর কেউ অতটা জানে না। গুজরাটে উপদ্বীপ অঞ্চল কচ্ছ উপত্যকা, উত্তর পূর্বদিকে রুক্ষ পর্বতমালা কচ্ছের রান ও আরাবল্লী থেকে প্রসারিত হয়ে দমন গঙ্গা পর্যন্ত বিস্তৃত পাললিক অঞ্চল। গুজরাটে সমতল এলাকা সবরমতি মাহি অপ্তি প্রভৃতি উদ্ভূত পাললিক শিলাময়ভূমি। গুজরাটের বর্ণনা দেওয়ার কারণ গুজরাটের ভূ-প্রকৃতিতে ক্ষুদ্র ভারতের আদল আছে, তাই বৃহত্তর ভারতে মোদীর কোনো অসুবিধা হবে না। তবে ২৭২ এর বেশি হলে নিঃসন্দেহে দেশের উন্নতি হবে। কম পড়লে ছোটদলের ছোট স্বার্থের কাছে মাথা নোয়াতে হবে। যেমন হয়েছিল বাজপেয়ীজীকে। তা যাতে না হয় সে চেষ্টা মনে প্রাণে সব ভোটারই করুন।

Sharada Travels

ভ্রমণ পিপাসু বাঙালীর নির্ভরযোগ্য সঙ্গী

শারদা ট্রাভেলস্

ফুলেশ্বর, উলুবেড়িয়া, হাওড়া

প্রত্যুষ মন্ডল — 9874398337

গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণ সূচী ২০১৪

ভ্রমণ	মুখ্য দর্শনীয় স্থান	দিন	শুভ যাত্রা	প্যাকেজ মূল্য
কাশ্মীর	জম্মু, শ্রীনগর, গুলমার্গ, সোনমার্গ, পহেলগাঁও, বৈষ্ণোদেবী	১৩	১৭ই মে	১৪,৫০০/-
দার্জিলিং	টাইগার হিল, ঘুম মনেস্ট্রী, বাতাসী, মিরিক	৬	৩০শে মে	৬,০০০/-
সিমলা	সিমলা, কুফরি, মানালী, রোটাংপাস, কুলু, মনিকরন	১১	১৮ই মে	১১,২০০/-
হরিদ্বার	হরিদ্বার-হৃষিকেশ, লক্ষ্মনঝোলা, দেরাদুন, মুসৌরী	৮	২৭শে মে	৬,২০০/-

ট্রেনের টিকিট নিশ্চিত করতে অবশ্যই যাত্রা শুরুর তিন মাস আগে যোগাযোগ করুন অথবা ডাকুন।

প্যাকেজে থাকছে :- ট্রেনে (স্লিপার ক্লাস), বড়/ছোট গাড়ীতে যাতায়াত, সাইড সিইং, সকালে চা টিফিন, লাঞ্চ,ডিনার (আমিষ/নিরামিষ),টোল ট্যাক্স,গাড়ী পার্কিং, ফ্যামেলি অনুযায়ী রুম।

প্যাকেজে থাকছে না :- ট্রেন চলাকালীন কোন রকম খাবার, এন্ট্রি ফি, কুলী ভাড়া,ক্যামেরা চার্জ, নৌকাবিহার, রোপওয়ে,হাতি/ঘোড়া চাপা, পুজো দেওয়া, ব্যক্তিগত ব্যবহারের গাড়ি ভাড়া।

স্কুল, কলেজে ও গ্রুপ টুরের জন্য যোগাযোগ করুন।

✸ ভ্রমণ শুরু ও শেষ, হাওড়া/শিয়ালদহ/ কোলকাতা অথবা উল্লেখ্য নির্দিষ্ট কোন স্থান থেকে ✸ হঠাৎ করে যানবাহনের ভাড়া বৃদ্ধি অথবা ভ্রমণ সম্পর্কিত বিষয়ে মূল্যবৃদ্ধি ঘটলে প্যাকেজ মূল্য বর্ধিত হবে। ✸ বালক / বালিকাদের ক্ষেত্রে (৫-১১ বৎসর) প্যাকেজ মূল্যের ৭৫% টাকা লাগবে। শিশুদের ক্ষেত্রে (২-৪ বৎসর) প্যাকেজ মূল্যের ২৫% টাকা লাগবে।

মধুমাস

নবকুমার ভট্টাচার্য

মধুমাস শিবের জন্মমাস। শিবঠাকুরের নাকি বিয়ে হয়েছিল এই মাসে। নীলচণ্ডিকা বা নীলচণ্ডীর সঙ্গে। আর সেই বিয়েতে বরযাত্রী ছিলেন সন্ন্যাসীরা। বরযাত্রী সন্ন্যাসীরা শিবের নামে গর্জন করে ধ্বনি দিয়েছিলেন বলে এই মাসকে গাজনের মাসও বলা হয়। অনেকে আবার বলেন, শিবের বিয়ে উপলক্ষে গ্রাম্য মানুষেরা গান রচনা করেছিলেন। এই 'গ্রামজনের গান' থেকেই গাজন কথার উৎপত্তি। প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে গাজন বা চড়ক উৎসব। চড়ক উৎসবের প্রধান দেবতা কালার্করুদ্র। তাঁর তিনটে চোখ— চন্দ্র, সূর্য আর অগ্নি। তাছাড়া রুদ্র বা শিবের আঞ্চলিক নামও রয়েছে। কৃষিকাজ, শস্য উৎপাদন ও জমির উর্বরতার প্রতীক হিসেবে এই সময় শিবের উপাসনা। বাংলার শিবভক্ত কৃষক বন্দনা করেছেন—

'বন্দনা করি গো আগে
ধান্য-শস্যে পঞ্চানন
একনিষ্ঠ কৃষিকর্ম
হয় যে সমাপন
ধান্য দূর্বা তৈল সিঁদুর
গোলায় প্রণাম ত্রিলোচন।'

শিব হলেন কৃষি দেবতা তাঁরই উৎসব গাজন। বাংলাদেশে নীলের গাজন। পশ্চিমবঙ্গে শিবের গাজন। একে কেন্দ্র করে যে উৎসব উত্তরবঙ্গে, বিশেষত মালদহে গম্ভীরা ও পুরুলিয়ায় ছৌ। এই মধুমাসেই বনবাসী মানুষের উৎসব 'বাহা'। বনের সম্পদ শাল গাছের উদ্দেশ্যেই এই উৎসব। মালদহ জেলার গাজোল, হবিবপুর, বামনগোলা থানার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে হয় 'বাহা'। গম্ভীরা মূলত আচার নৃত্য। নৃত্যের ছন্দে শিববন্দনা। গম্ভীরা রূপটি সংহত হয় দশম একাদশ শতক থেকে। সেন রাজাদের আমল থেকে। গম্ভীরা অনুষ্ঠানের চারটি অংশ। মুখপাদ অর্থাৎ পরিচয় জ্ঞাপন। মুখপাদ মূলত বন্দনা অংশে মাত্রা পায়। শিবস্তুতি তার মূল অংশ। শিবের ভূমিকায় এক অভিনেতা শিব সেজে ওঠেন। শিবের রূপক চরিত্র। অন্যান্য চরিত্রগুলির পোশাক-আশাক মলিন জীর্ণ। তারা নৃত্য করে গীত গায়। সমাজের দুঃখ দুর্দশার কথা শিবকে জানায়। পশ্চিম দিনাজপুরের রায়গঞ্জে গম্ভীরা সঙের গানে ইংরেজি-বাংলা শব্দের মিশেল লক্ষণীয়—''গুড নাইট গড শিব ঠাকুর তোমার চরণে। ইউ আর অল ফাদার-মাদার রাখ সন্তানে।''

শিল্পকলা মাধুর্যে অনুপম নৃত্য নাট্যকলা-সমৃদ্ধ ত্রিধারার ছৌ গ্রামীণ মানুষের আমোদের যথার্থ উপকরণ। শিব ও শক্তি আরাধনা চৈত্রপর্বের উৎসবের অঙ্গস্বরূপ হয়ে উঠেছে। মধুমাসে সারা ভারত জুড়ে হয় মেলা। জয়পুরের চাকসুতে শীতলামাতার মন্দিরে মেলা বসে চৈত্রমাসে। সে মেলা দেখার জন্য দর্শকের অভাব নেই। জয়পুর থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে এই গ্রাম। রাজস্থানের মেলাপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য পালি জেলার সোনানা গ্রামে শ্রীসোনানা খেতলাজি দেবমন্দিরে উৎসব। পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার আলমপুর গ্রামে ক্ষেত্রপালের মেলা এই মধুমাসেই।

দক্ষিণ ভারতে পুরো মধুমাস জুড়ে চলে 'পঞ্চাঙ্গ শ্রবণ'। এ এক অপরূপ বিধি। সংস্কারও বটে। গৃহ-পুরোহিত বর্ষপঞ্জি শোনান। শুভ-অশুভ, দিনক্ষণ শোনান। নক্ষত্রের অবস্থান বলেন। কেবল পরিবারের কথা নয়। দেশ, সমাজের ভালো মন্দ সময় বলেন। সৌরমণ্ডলীর কক্ষ পরিবর্তন, গ্রহের অবস্থান নিয়ে ভবিষ্যতের কথা বলেন। এ এক পরম্পরা। চৈত্র শুক্লপক্ষের প্রথমদিন কাশ্মীরের নববর্ষ। যার প্রচলিত নাম নবরেহ। 'নবরেহ' উৎসবের জাঁকজমক তার আচারগত অনুষ্ঠান ও পুজো পর্বে। ওইদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠেই পরিবারের সদস্যদের পাত্র ভর্তি চাল দেখতে হয়। এই দর্শনের মধ্যে সম্পদ-সুখ মেলে। সেটাই লোকবিশ্বাস। তারপর পবিত্র স্নানের জন্য ঝরনার জল প্রথম পছন্দ। স্নানের পর জড়িবুটিসহ ঘরে তৈরি চালের পিঠে প্রসাদস্বরূপ গ্রহণ করেন কাশ্মীরের পণ্ডিত পরিবার। পরিবারের কুলগুরু কাশ্মীরি পঞ্চাঙ্গ অর্থাৎ নেচিপত্র পরিবারবর্গের সকলকে প্রদান করেন। এতে থাকে ভবিষ্যতের ফলকথন। ওড়িশায় মধুমাসের মূল আকর্ষণ শিব ও গৌরীর প্রতি পুজো অর্ঘ্য নিবেদনকে কেন্দ্র করে নৃত্যানুষ্ঠান। এই মাসে ওড়িশায় বিভিন্ন স্থানে 'ঝামুযাত্রা', 'পটুয়াযাত্রা' 'ঝানিযাত্রা' 'দণ্ডযাত্রা' 'উড়াপরব' 'ঝুলাপরব' প্রভৃতি পালিত হয়।

চৈত্র মাসের কৃষ্ণ ত্রয়োদশী তিথিকে বলা হয় 'মধুকৃষ্ণাত্রয়োদশী'। এই তিথিতে গঙ্গাতে আম উৎসর্গ করে তবে আগামীদিনে আম খেতে হয়। লৌকিক মতে যা আমবারুণী নামে পরিচিত। অযোধ্যাতে হয় মধুপরিক্রমা আর গয়াতে পিতৃমেলা। মধুমাসে গয়াতে পিতৃপুরুষকে পিণ্ডদান করলে পিতৃপুরুষ তৃপ্ত হন। ত্রিপুরায় চাকমা উপজাতির সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক থেকে চতুর্থ। চাকমা জনগোষ্ঠীর সর্বাধিক প্রিয় উৎসব 'বিজু'। এই উৎসব সমাজ ধর্মের নিরিখে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিজু মূলত বর্ষ বিদায়ের অনুষ্ঠান। ঝাড়খন্ড রাজ্যেও শিবভক্তদের আরোপিত যন্ত্রণায় আবদ্ধ হওয়ার ঘটনা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এই রাজ্যে শিববন্দনামূলক নৃত্যের নাম দণ্ড নৃত্য। এই নৃত্যকলা বিনোদনমূলক। তার বিভিন্ন আঙ্গিকাভিনয় যেমন গৌরীবন্দনা, শিব পার্বতী, কেল কেলুনি প্রভৃতি। তবে এই গীতসমূহ পুরাণ কিংবদন্তি আশ্রিত শুধু নয়, সামাজিক জীবন প্রবাহে সমৃদ্ধ।

বাংলার মন্দিরে মন্দিরে

পর্ব-২২

শ্রীচৈতন্য পরবর্তী যুগের নূতন ধারা

বর্গভীমা মন্দির, তমলুক

ডঃ প্রণব রায়

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার প্রধাননগর বা রাজধানী তমলুক শুধুমাত্র মন্দির-অধ্যুষিত স্থান হিসেবে পরিচিত নয়, এই স্থানের ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিক গুরুত্ব অপরিসীম। সুপ্রাচীন তাম্রলিপ্ত রাজ্যের একটি নগর বর্তমান তমলুককে সুপরিচিত করলেও তাম্রলিপ্তের বিস্তার অনেক দূর পর্যন্ত ছিল। তমলুক শহরের নানা স্থান থেকে মৌর্য, শুঙ্গ, গুপ্ত, পাল ও আদি মধ্যযুগের বহু পুরাবস্তু ও আসবাবপত্র পাওয়া গেছে যার সাহায্যে এখানের গুরুত্ব কতখানি তা বোঝা যায়।

প্রাচীন বন্দরনগর তাম্রলিপ্ত বা তাম্রলিপ্তি থেকে একসময় বহু জাহাজ দেশ-বিদেশে যাতায়াত করত। প্রাচীন তাম্রলিপ্ত রাজ্যের রাজধানী এই তমলুকের পরিধি দশ লি'র বেশি বলে চৈনিক পরিব্রাজক সুয়ান সাঙ (হিউয়েন সাঙ) খৃস্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে উল্লেখ করে গেছেন। সমগ্র তাম্রলিপ্ত রাজ্যের পরিধি ছিল ১৪০০ 'শ লি.।

তমলুক ও তার আশপাশ থেকেও কোনো কোনো স্থান উৎখনন করে বিভিন্ন যুগের সভ্যতা সংস্কৃতির নিদর্শন ও পরিচয় জানা গেছে। বর্তমান প্রসিদ্ধ বর্গভীমা মন্দির যে উচ্চস্থানে অবস্থিত, সেটি সম্রাট অশোকের সময় প্রতিষ্ঠিত একটি স্তূপ ছিল বলে কারও কারও ধারণা। সুয়ান সাঙ একটি স্তূপ এখানে দেখেছিলেন।

তমলুকের পুরাবস্তুগুলির তুলনায় মন্দিরগুলি আধুনিক এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বর্গভীমার মন্দির যে স্থানে অবস্থিত, সেখানে একুশটি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়। মূল মন্দির বা 'বড়দেউল' ('বিমান') ও 'জগমোহনে'র মাঝখানে আছে 'অন্তরাল' ও 'যোগমণ্ডপ'। 'বড় দেউলে'র বাইরের চার দেওয়ালে প্রায় সারিবদ্ধভাবে কয়েকটি টেরাকোটা মূর্তিফলক সন্নিবেশিত। দেওয়ালের চারপাশে মূর্তিফলকগুলির মধ্যে রামসীতা, ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ, চতুর্মুখ ব্রহ্মা, মূষিকবাহন গণেশ, চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী, কার্তিক, বীনাহস্তা সরস্বতী, শিবদুর্গা, যুদ্ধরত রামচন্দ্র, লীলাপদ্মহস্তা নায়িকা, বকাসুরবধ, মকরবাহন গঙ্গা, ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন প্রভৃতি মূর্তি উল্লেখযোগ্য। মূর্তিগুলির কারুকার্য সুন্দর ও উচ্চমানের বলা যায়। বর্গভীমা মন্দির কয়েকবার সংস্কার করা হয়েছে। সম্ভবত আগে টেরাকোটা-ফলকগুলি মন্দিরের বিভিন্ন স্থানে ছিল অথবা প্রাচীন কোনো বিধ্বস্ত মন্দির থেকে এগুলি এসে বসানো হয়েছে।

স্থাপত্যের ক্ষেত্রে বর্গভীমা মন্দিরের কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। 'বড় দেউলে' ওড়িশী 'শিখর' শৈলীর প্রভাব স্পষ্ট হলেও শীর্ষভাগের বৈশিষ্ট্য আছে। বেশি অংশ কিছুটা বর্তুলাকার হয়ে ওপরে উঠে গেছে। 'আমলক' ছোট। সকলের ওপরে মৃন্ময় ফলকের ওপরে একটি রৌপ্য নির্মিত ফলক স্থাপিত। নাটমন্দিরটি 'চারচালা'-রীতির।

গর্ভগৃহের পূর্বদিকের দেওয়াল সংলগ্ন একটি উচ্চ বেদিতে ভীমা দেবী অধিষ্ঠিতা। পাথরের এই দেবীমূর্তি চতুর্ভুজা, শবোপরি আসীন, ডাইনের ওপরের হাতে খড়্গ ও নীচের হাতে ত্রিশূল। বামহাতের ওপর হার্তে খর্পর' (পানপাত্র) এবং নীচের হাতে নৃমুণ্ড।

বর্গভীমা বহু পরিচিতা এক দেবী। কারও কারও ধারণা ইনি পূর্বে তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণীর পূজিতা বা প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন। মন্দিরের পাশে নীচে একটি ছোট্ট পুকুর বা ডোবাকে 'কুণ্ড' বলা হয়। দেবীর ভোগে প্রতিদিন মৎস্য (বিশেষ করে, শোল মাছ) দেওয়ার রীতি। তমলুকের রাজপরিবার দেবীর প্রধান সেবায়েৎ। এই বর্গভীমার বার বার উল্লেখ প্রাচীন মঙ্গলকাব্যসমূহে পাওয়া যায়।

তমলুক শহরে আরো বহু মন্দির বর্তমান। কয়েকটি বর্গভীমার রীতিতে নির্মিত। রাজবাড়ি ও জিষ্ণুহরির মন্দির এই রীতিতে তৈরি। কিন্তু বর্গভীমার মন্দির মনোরম শৈলীতে নির্মিত।

মর্মে ও কর্মে রঙ লাগানোর গান

শান্তিনিকেতনে দোল উৎসবকে 'বসন্ত উৎসব' বলা হয়— এটা সপ্তর্ষি জানে ছোট থেকে। বেশ কয়েকবার সে দেখেছে বসন্ত উৎসব। কত বর্ণময় আনন্দে ভরা সমস্ত অনুষ্ঠান। দোলের আগের দিন বিকেলে অনুষ্ঠানের শুরু। প্রস্তুতিপর্ব বলা যায়। রাত আটটা-নটার মধ্যে অনুষ্ঠান শেষ হয়। যে যার নিবাসে ফিরে গিয়ে খাওয়া বিশ্রাম ঘুম। দোলের দিন ভোর থেকে যেন সেজে ওঠে শান্তিনিকেতন। মানুষ আর প্রকৃতি মিলেমিশে যায় উৎসবের আনন্দে ছন্দে রূপে বর্ণে। একটানা গাওয়া হয় উৎসবের ধ্রুবপদের মতো : 'ওরে গৃহবাসী খোল দ্বার খোল, লাগল যে দোল/স্থলে জলে বনতলে লাগল যে দোল খোল দ্বার খোল।' এই গানটি সমবেত কণ্ঠে বারবার গাওয়া হয়। বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা নাচতে নাচতে উৎসব অঙ্গনে হাজির হয় পর পর। দর্শকের মধ্যে মিশে থাকেন নামী অনামী কতজন। ভালোলাগা যেন সুরের ঢেউ তুলে ছড়িয়ে যায় সকলের মধ্যে। কেউ যেন পড়ে না বাদ বা বাকি— এটাই হয়তো উৎসবের মূল কথা। শান্তিনিকেতনের বসন্ত উৎসব প্রতিবারই নতুন মনে হয় সপ্তর্ষির।

এবছর যাওয়া হয়নি ওদের। দোলের দিন ছুটি। কিন্তু যেখানে নাচ-গান-নাটক-আবৃত্তি শেখে সেখানে আগেরদিন 'বসন্ত উৎসব' হবে সকালবেলা— এটা জানার পর তার মন খারাপ হয়নি। শান্তিনিকেতনে এবছর যাওয়া হবে না সপ্তর্ষির বাবা আগেই জানিয়েছিল। কারণ দাদাই অসুস্থ। দাদাই মানে সপ্তর্ষির ঠাকুর্দা। দলবেঁধে শান্তিনিকেতনে যাওয়ার সময় দাদাই সঙ্গে থেকেছে। সব অনুষ্ঠান দেখেছে। কত অচেনা চেনা ছেলেমেয়ে দাদাইকে প্রণাম করে রঙ দিয়েছে। তাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে একটা করে কার্ড দিয়েছে। তাতে রবীন্দ্রনাথের ছবি নেই। গুচ্ছ গুচ্ছ পলাশের ছবি। তার উপরে লেখা 'রঙ যেন মোর মর্মে লাগে, আমার সকল কর্মে লাগে।' নিচে লেখা : রবীন্দ্রনাথের ওই কথা যেন সকলে অন্তর থেকে বলতে পারি।' একেবারে নিচে খুব ছোট হরফে দাদাইয়ের নাম ঠিকানা ছাপা থাকত। কার্ডটা তৈরি করে দিয়েছিল সপ্তর্ষির বাবা।

সপ্তর্ষিদের নাচ-গান-নাটকের স্কুলের গানের দিদিমণি কৃষ্ণা বসু বেশ কয়েকমাস বিদেশে মেয়ের কাছে ছিলেন। আবার ফিরে যাবেন মাসখানেক বাদে। তিনি চেয়েছিলেন, 'বসন্ত উৎসবের আয়োজন আমরা তো করতে পারি।' সম্পাদক বললেন, 'তোমরা করতে পারলে ভালোই। তবে দোলের দিন হবে না। আগে বা পরে একটা দিন বেছে নাও।' দিন ঠিক হবার খবর জানতেই উৎসাহের ঢেউ ছড়িয়ে গেল ছোটদের মধ্যে। ছোটরা উৎসাহী হলে বড়োরা তো মেতে উঠবেনই।

শান্তিনিকেতনের মতো নয়, তবে বেশ সুন্দর সুরুচিপূর্ণ উৎসব হলো কয়েক ঘণ্টা ধরে। সেদিন শেষ গান ছিল 'রাঙিয়ে দিয়ে যাও যাও গো এবার যাবার আগে।' এই গান সপ্তর্ষি শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসবে প্রতিবার শুনেছে। কখনও পুরনো হয়নি। কৃষ্ণাদির কাছে তিন চারদিন গানটা একটু অভ্যেস করে ছিল ওরা কয়েকজন। অনেকগুলো গানের মধ্যে শেষ গান ছিল ওটি। স্বরবিতানে গানটার স্বরলিপি রয়েছে। স্বরলিপি করেছেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ১৯২৭ সালের ১৩ মার্চ। কৃষ্ণাদি বারবার বলেছেন, 'বিশ্বভারতীর বই ছাড়া কোনো বই রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়া বা পড়ার জন্যে ব্যবহার করবে না। কারণ অন্য বইগুলো নির্ভরযোগ্য নয়।' সপ্তর্ষিরা গাইল কয়েকজন মিলে : 'রাঙিয়ে দিয়ে যাও যাও গো এবার যাবার আগে—/ তোমার আপন রাগে, তোমার গোপন রাগে,/ তোমার তরুণ হাসির অরুণ রাগে/ অশ্রুজলের করুণ রাগে।'/ সপ্তর্ষি লক্ষ্য করল অনেকেই গলা মিলিয়েছে। 'রঙ যেন মোর মর্মে লাগে, আমার সকল কর্মে লাগে,/সন্ধ্যাদীপের আগায় লাগে, গভীর রাতের জাগায় লাগে।/ যাবার আগে যাও গো আমায় জাগিয়ে দিয়ে,/ রক্তে তোমার চরণ-দোলা লাগিয়ে দিয়ে।' সপ্তর্ষি দেখল গানের সব দিদিমণি গলা মিলিয়েছেন— চয়নিকা, শাশ্বতী, স্নেহা, অদিতি, অপর্ণা। কৃষ্ণাদি তো আছেনই। এছাড়া আরও কেউ কেউ। গানের শেষ অংশে পৌঁছে গেল ওরা। 'আঁধার নিশার বক্ষে যেমন তারা জাগে,/ পাষাণ গুহার কক্ষে নিঝর ধারা জাগে/ মেঘের বুকে যেমন মেঘের মন্দ্র জাগে,/ বিশ্ব-নাচের কেন্দ্রে যেমন ছন্দ জাগে,/ তেমনি আমায় দোল দিয়ে যাও যাবার পথে আগিয়ে দিয়ে/ কাঁদন-বাঁধন ভাগিয়ে দিয়ে।।' গানটা শেষ হওয়ার পর তার রেশ রয়ে গেলো। নাচের দিদিমণি লিপিকা আর অনুব্রতী পুরো অনুষ্ঠানটা রেকর্ড করেছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে দেখা গেল গুনগুন করে গাইছেন অনেকেই। কৃষ্ণাদি বললেন, 'পরের সপ্তাহে বিদেশ চলে যাচ্ছি। ছবি দেখবো গান শুনবো বারবার। পরের বছর আরও ভালো করতে হবে।'

সপ্তর্ষি বাড়ি ফিরে গাইছিল 'রাঙিয়ে দিয়ে যাও গানটা। দাদাই এসে বসল গান গাওয়ার সময়। বলল, 'আমাকে গানটা দুবার শোনাও দাদুভাই।' সপ্তর্ষি শুরু করল একমনে 'রাঙিয়ে দিয়ে যাও।'

×

ছোটোদের ভাবনা

‘যদি প্রধানমন্ত্রী হতাম’

কৌশিক গুহ

ভোটের সময় দেবাদৃতাদের স্কুলে ছুটি থাকে। ওইদিন সকলেরই ছুটি। ওদের স্কুলে ভোটকেন্দ্র বা ভোট দেওয়ার জায়গা হয় প্রত্যেকবার। অনেকবার ভোট হয় অনেকরকম। সবচাইতে বড় ভোট সাংসদ নির্বাচন। সাংসদ শব্দটা একটু কঠিন হলেও তার মানে জেনে গেছে ওরা। খবরের কাগজে টেলিভিশনে বারবার বলা হচ্ছে। পাঁচ বছর ছাড়া ভোট হওয়ার কথা। এর আগে যে বছর ভোট হয়েছিল তখন দেবাদৃতা ক্লাস টু-তে পড়ত। তারপর ষাট মাস পেরিয়েছে। সে এখন ক্লাস সেভেনের ছাত্রী। চারপাশে ভোট নিয়ে খুব হইচই। পিসি বলছিল, ‘কদিন বাদে

আরও বাড়বে।’ আগের বারের ভোটের সময় অনেক ছোট ছিল। তারপর ষাট মাসে সে এত বড়ো হয়েছে। কতকিছু জেনেছে শিখেছে। স্কুলে সুতপাদি বাংলা পড়ান। ঠিক হলো ভোটের আগে একদিন মজার অনুষ্ঠান হবে। ‘আমি যদি প্রধানমন্ত্রী হই।’ ছোটোরা চারপাশে যা দেখছে শুনছে তা থেকে তারা নিজস্ব বোধ বিবেচনা গড়ে তুলছে। বিভিন্ন বিষয়ে তারা ভেবেচিন্তে কথা বলছে। বড়রা অনেকে মন দিয়ে ছোটোদের কথা শোনে। সুতপাদি ঠিক করলেন কুড়িজন অংশ নেবে।

দু'তিনটে বাক্যের বেশি বলা যাবে না। প্রত্যেকের খেয়াল রাখতে হবে একজনের কথা অন্য অন্যজনের কথায় মিল থাকবে না। আলাদা কথা বলতে হবে। ঘণ্টা বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে শুরু করবে সে যার নাম বলা হবে। আবার থামতে হবে ঘণ্টা বাজলে। সুতপাদি বললেন, ‘সৌমিলি।’

সে বলল, ‘আমি প্রধানমন্ত্রী হলে স্কুলে পড়াশোনার চাপ কমিয়ে দেবো। নাচ গান খেলা আঁকাজোকা— এসব বাড়বে। পরীক্ষা থাকবে না কোনও।’ ঘণ্টা বাজল। এরপর দেবাঙ্গনা শুরু করল, ‘স্কুলে কোনও হোমটাস্ক থাকবে না। খেলার মাঠ যাতে ঠিকভাবে তৈরি থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখবো।’ সে থামার পর শুরু করল চয়নিকা, ‘গরিব ছেলেমেয়েরা যাতে ঠিকমতো খেতে পরতে পড়তে পারে তা দেখবো। তারা যেন আনন্দের সঙ্গে বড়ো হয়।’ পরের নাম এলো দেবশ্রী। সে স্পষ্টভাবে বলল, ‘কোনও স্কুলের দেয়ালে কেউ কিছু লিখতে পারবে না। লিখলে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা হবে।’ এরপর বলতে উঠল অয়ন্তিকা। ‘কোন্ কোন্ ছেলেমেয়ে স্কুলে আসতে পারছে না, কেন পারছে না— সেদিকে লক্ষ্য রাখার কথা সকলকে মনে করিয়ে দেবো।’ পরের নাম এলো বর্ণালী। চারপাশ দেখে নিয়ে বলল, ‘ছোটোদের জন্যে অনেক পার্ক, বেড়াবার জায়গা তৈরি করে দেবো।’ সুতপাদি এবার ডাকলেন চন্দনাকে। সে জানাল, ‘পাড়ায় পাড়ায় ছোটোদের জন্যে খেলার মাঠ তৈরি করে দেবো। ছোটোরা যাতে সেখানে নিজস্ব জগৎ পায় সেদিকেও লক্ষ্য রাখবো।’

এরপর বলার পালা বৈশালীর। সে জানাল, ‘রাস্তায় যারা থুতু ফেলে তাদের কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করবো।’ এরপর ডাক এলো স্মৃতিরেখার। তার বক্তব্য স্পষ্ট, ‘পাড়ায় পাড়ায় হাতের নাগালে ছোটোদের লাইব্রেরি থাকবে। সেখানে খেলার ছলে পড়ার ব্যবস্থা থাকবে।’ প্রত্যেকের কথা ধরে রাখা হচ্ছে শব্দ ধরার যন্ত্রে। তার মানে টেপ রেকর্ডারে।

এরপর নাম এলো দেবাদৃতার। সে জানাল, ‘সকলের ঠিকমতো চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে। টাকার অভাবে কেউ যেন চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়।’ এর পরের নাম সংহিতা। সে জানাল, ‘রাস্তার দুপাশে থাকবে গাছ, বাগান বাড়বে।’ সুতপাদি ডাকলেন অনুশ্রীকে। তার বক্তব্য স্পষ্ট, ‘যারা খারাপ কাজ করবে তাদের কড়া শাস্তির ব্যবস্থা হবে।’ পরের নাম মধুমিতা। সে জানাল, ‘সারা দেশে সব কাজ যাতে ঠিক সময়ে ঠিকভাবে হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবো।’ এরপর বলতে উঠল অদিতি। চটপট বাক্য সাজাল, ‘আমি দেশজুড়ে এমন লোকজন গড়ে তুলবো যারা মন দিয়ে কাজ করবে। দেশকে, মানুষকে ভালোবাসবে।’ পরের নাম চিরশ্রী। সে বলল, ‘প্রত্যেকে কাজের মজুরি যাতে ঠিকমতো পায় তার ব্যবস্থা হবে। কাউকে কম পয়সা দিয়ে বেশি খাটানো চলবে না।’ সুতপাদি বললেন, ‘এবার বিশাখা।’ সে বলল, ‘দেশে অনেকরকম কাজ হবে। কেউ চুপচাপ বসে থাকবে না। কিছু-না-কিছু করবে।’ এরপর এলো অহনার নাম। সে বলল, ‘ছোটোরা যাতে কোনোরকম কষ্ট না পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখবো। তারা আনন্দের সঙ্গে বড়ো হবে।’ উপাসনার নাম বললেন সুতপাদি। মাথা উঁচু করে বলল, ‘সকলের কথা আমি ভাববো। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলার জন্যে প্রতিদিন অনেকটা সময় থাকবে।’ নাম ডাকা হলো নিবেদিতার। সে জানাল, ‘আমার যারা বিরোধী থাকবে তাদের বলবো, স্পষ্ট করে সব কথা জানাও।’ সুতপাদি এবার বললেন, ‘শেষ নাম গীতশ্রী।’ সে বলল, ‘আমি প্রধানমন্ত্রী হলে ছোটোদের বন্ধু হওয়ার চেষ্টা করবো সবসময়।’

এসব যখন চলছে বড়দি একসময় ঢুকে শেষ বেঞ্চে বসেছিলেন। ছোটোদের কথা শেষ হতে তিনি এগিয়ে এসে বললেন, ‘চমৎকার তোমাদের ভাবনা। সবাই বড়ো হও। এগিয়ে চলো। প্রত্যেককে একটা বই দিচ্ছি আমি।’ সকলে খুশিতে হাততালি দিলো।

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

বই কথা কই

রিয়ার ঠাকুমা

রিয়াদের বাড়িতে সকলেরই পড়ার অভ্যেস আছে। রোজই কিছু-না- কিছু পড়া চাই। এটা বাধ্যতামূলক কোনো ব্যাপার নয়। ভালো লাগা জড়িয়ে আছে। বইয়ের ছাপা পাতার মধ্যে এমন একটা টান রয়েছে যা বাড়ির কেউ এড়াতে পারবে না। আর এইভাবেই বাড়িতে জমে গেছে অনেক বই। কেউ কখনও বইকে বোঝা ভাবে না। একবার কোনো বই এলে তা না-পড়া অবস্থায় থাকবে না। ছোটোদের বই বড়োরা পড়ে। ছোটোরা কয়েকবার পড়ে নেয়। বড়োদের বই অবশ্য ছোটোরা পড়ে না। তবে দেখতে হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করায় কোনো আপত্তি নেই। রিয়া যখন খুব ছোটো ছিল পড়তে শেখেনি তখন বই তুলে নিত অন্যদের দেখাদেখি। হয়তো উলটো করে ধরত। আপন মনে পড়ে যেত। ঠাকুমা হাসত না। কাছে এসে বলত, 'বইটা ঘুরিয়ে নাও দিদিভাই।' এখন রিয়া কত বই পড়ে। ইংরেজি বাংলা। তার ভালো লাগা বই কম নয়। বইগুলো তাকে সঙ্গ দেয়। অনেক কথা বলে।

ঠাকুমা বলত, 'বইকে একবার ভালো লাগলে দেখবে সে তোমাকে টেনে নেবে।' ঠিক তাই। কত কথা লুকিয়ে আছে ছাপা পাতাগুলোর মধ্যে। একটু একটু করে বড়ো হওয়া। একটা করে দিন চলে যায়। তার মধ্যে খাওয়া খেলা ঘুমের জন্যে সময় ঠিক করা আছে। স্কুলের পড়ার জন্যেও। একটু সময় টেলিভিশন দেখে।

গান শোনে। নিজে গানের রেওয়াজ করে কিছুক্ষণ। এর মধ্যেই রয়ে গেছে অন্য বই পড়ার সময়।

রিয়ার স্কুলের এক দিদি বলেছিলেন, 'স্কুলের সব বিষয়গুলো মন দিয়ে পড়তে হবে। জানতে হবে। শিখতে হবে।' ঠিক তাই, তার মধ্যে কোনোটা একটু বেশি ভালো লাগবে, কোনোটা কম। ঠাকুমা বলত, 'সবরকম খাবার খেতে হবে। তিতো টক মিষ্টি।' ঠাকুমা শিখিয়েছিল রোজ একরকম খাবার নয়। তাহলে একঘেয়ে হয়ে যায়। বদলে বদলে খাওয়া। প্রথম প্রথম নিমপাতা খেতে একটুও ভালো লাগত না। তার স্কুলের বন্ধুদেরও এক অবস্থা। এখন নিমপাতা দারুণ পছন্দ করে। বাড়ির তৈরি টিফিন বরাবর স্কুলে নিয়ে গেছে। এখনও তাই। আসলে স্কুলেরও কড়া নির্দেশ ছিল— বাড়ির তৈরি খাবার আনতে হবে। ঠাকুমা নানারকম টিফিন করে দিত। টিফিনের সময় হাত ধুয়ে খেতে হোত। প্রথমদিকে রিয়া নিজে খেতে পারত না। কোনো দিদি সাহায্য করতেন। সব শিখে নিয়েছে। ওদের কোনো কোনো বন্ধুর মা একেকদিন টিফিন দিতে ভুলে যায়। বন্ধুটি চুপ করে বসে থাকে। তার খিদে পেয়েছে বলতে পারে না। রিয়া অনেকদিন বলেছে, 'আয়, দুজনে ভাগ করে খাই।' রিয়ার ঠাকুমা আর মা কোনোদিনও টিফিন দিতে ভোলেনি। খাওয়ার জলও দিয়ে দেয়।

ঠাকুমা তাকে শিখিয়েছিল ইংরেজি বাংলা পড়তে অঙ্ক করতে। প্রথম প্রথম গান শিখেছিল ঠাকুমার কাছে। এখন সবসময় মনে পড়ে ঠাকুমার কথা। খুব ভালো বন্ধু ছিল তার। স্কুলের ম্যাগাজিনে লিখেছিল 'আমার প্রথম বন্ধু আমার ঠাকুমা।' লেখাটা পড়ে বড়দি ডেকে বলেছিলেন, 'খুব ভালো হয়েছে।' শুধু তাই নয় একটা বই উপহার দিয়েছিলেন। বইটা রিয়ার খুব পছন্দের। ঠাকুমাকে দেখাতে পারেনি।

বইমিত্র

সদানন্দের ভ্রমণ

ভারতীয় চিন্তনে মা

শতভিষা সরকার

নারী-পুরুষের পতি পত্নীরূপে বসবাসের স্বীকৃতি হলো পরিবার জীবনের মূলভিত্তি। পরিবার সমষ্টি নিয়েই সমাজ। পরিবারের কেন্দ্রবিন্দু 'মা'। তাই আমাদের দৃষ্টিতে প্রতিটি পরিবার মাতৃতান্ত্রিক। গার্হস্থ্য জীবনে নারী তিনটি রূপে বিকশিত হন--- কন্যা-জায়া-জননী। নারীর এই তিনটি রূপের মধ্যে ভারতীয় চিন্তায় মাতৃরূপই শ্রেষ্ঠ। মাতৃত্বকে শ্রেষ্ঠত্বে প্রতিষ্ঠিত করে ভারতীয় ঋষিরা একটি বৈপ্লবিক কার্য নিঃশব্দে সুসম্পন্ন করেছেন। মাতৃত্বের মাধ্যমে নারীত্বকে দেবীত্বে উপনীত করেছেন— 'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।' ভারতীয় সমাজে মাতৃত্বেই নারীত্বের সার্থকতা। পত্নীত্ব অপেক্ষা মাতৃত্বকেই ভারতবর্ষ চিরকাল অগ্রাধিকার দিয়েছে, মর্যাদায় ভূষিত করেছে।

ভারতীয় সমাজ নারীকে জন্মগ্রহণ থেকেই সম্মান জানিয়ে এসেছে। কন্যালাভ আমাদের কাছে লক্ষ্মীলাভ স্বরূপ। আজও আমরা কুমারী পূজা করি। আজও আমাদের একটি বিখ্যাত তীর্থ কন্যাকুমারী। আমাদের বিশ্বাস, কুমারীর মধ্যে আদ্যাশক্তি মহামায়া বিরাজ করছেন। বৈদিক যুগে তো পুত্র-কন্যায় কোনো সামাজিক ভেদ ছিল না। কন্যার উপনয়ন সংস্কার হোত। দেবী সরস্বতী আজও উপবীতধারিণী। বিদ্যালাভের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের কোনো ভেদ ছিল না; সকলেই বিদ্যার্জনের অধিকারী ছিল এবং গুরুগৃহে অন্তেবাসী হয়ে বিদ্যালাভ করতে পারত। কন্যাকে বেদপাঠেরও অধিকার দেওয়া হয়েছিল। অথর্বসংহিতায় (১১-৫-১৮) বেদ পাঠের ছাত্রী তরুণ বর লাভ করবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বৈদিক যুগে নারীরা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি হিসাবেও স্বীকৃতি লাভ করেছিল। নারী ঋষির প্রতিভার ভিত্তি ছিল তাঁদের শৈশবকালীন শিক্ষাদীক্ষা। সে যুগে দুইরকম শিক্ষিতা নারীর পরিচয় পাই--- 'সদ্যোদ্বাহা' ও 'ব্রহ্মচারিণী'। প্রথমোক্ত শ্রেণীর নারীরা বিবাহকাল পর্যন্ত এবং শেষোক্ত নারীরা আজীবন বিদ্যাচর্চা করতেন।

যাহোক, কন্যাকে এইভাবে সুশিক্ষিত করে বিবাহ দেওয়া হোত। ঋগ্বেদ সংহিতার ১০—৮৫ সূক্তের মন্ত্রসমূহ থেকে ভারতীয় বিবাহের আদর্শ সম্পর্কে জানা যায়। এটি পৃথিবীর প্রাচীনতম লিখিত দলিল, যা থেকে আমরা সভ্য সমাজের বিবাহ প্রথার একটি আদর্শ চিত্র পাই। বৈদিক যুগে ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতি যে কত উন্নত ছিল এই সূক্তটি তার উজ্জ্বল নিদর্শন। ভারতীয় সমাজে স্ত্রী স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী— কী গার্হস্থ্য জীবনে, কী অধ্যাত্ম জীবনে। স্ত্রী ব্যতীত স্বামী কোনো ধর্মীয় কাজ করতে পারতেন না; কিন্তু স্বামী ব্যতীত স্ত্রী নিজেই সকল প্রকার ধর্মকার্য করতে পারতেন। ভারতীয় সমাজে পত্নীর স্থান এমনই উচ্চাসনে অবস্থিত।

তারপর মাতৃত্ব লাভ করলে পত্নীর সামাজিক মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি পেত। মায়ের প্রতি অকপট শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ভারতীয় সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আমাদের শাস্ত্রে মাতাকে সহস্র পিতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। জাতিচ্যুত পিতাকে বর্জন করা যায়, কিন্তু মাতাকে কখনো নয়। 'গর্ভধারণাভ্যাং পোষণাভ্যাং তাতান্মাতা গরীয়সী।' শ্রীরামকৃষ্ণ পত্নীকে মাতৃরূপে পূজা করে তাঁকে আদ্যাশক্তি মহামায়া রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই মায়ের কাছেই স্বামীজী অহরহ প্রার্থনা করতে বলেছেন— 'মা, আমায় মানুষ করো।' অর্থাৎ মানুষ করার চাবিকাঠিটি কিন্তু মায়ের হাতে।

আজ ভারতীয়রা ছিন্নমস্তা পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করে মাতৃচেতনা থেকে অপসৃত হচ্ছে বলেই নিত্যনতুন নারী নির্যাতনের ফুলঝুরি জ্বলছে। এই নির্যাতন আইনে রোধ করা যাবে না। পুরুষের চেতনায় যদি 'মাতৃবৎ পরদারেষু' শিক্ষা না থাকে তবে প্রত্যহ সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত হবে। আজ ইউরোপ নারীকে অনেক ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে পুরুষের সমান অধিকার দিতে চেষ্টা করছে; আর ভারতবর্ষ সেই বৈদিক যুগ থেকে নারীকে মাতৃত্বের মাধ্যমে, দেবীত্বের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়েছে। এটিই ভারতীয় সমাজের সাধনা।

DAS STEEL UDDYOG

Naldubi, Mangalbari, Po.+Dist. : Malda

সবরকম স্টীল ফার্নিচার, গ্রীলগেট এবং ফেব্রিকেশনের কাজ করা হয়

Show Room

—ঃ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ—

GEETANJALI FURNITURE

Jhaljhalia, Station Road, Malda

Phone : 03512-266063, Mobile : 9733387091

অতিথি কলম

সব কিছুই সকলের মনোমত নাও হতে পারে, তবু পছন্দের সেই একজনই

এম জে আকবর

পুরোনো কথা

১৯৮২ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী নরসীমারাও একটি মজাদার গল্প প্রায়ই বলতেন। ১৯৭৭ সালের নির্মম পরাজয়ের রেশ কাটতে না কাটতেই ১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধী স্বমহিমায় আবার নির্বাচনে জিতে সদ্য দিল্লীর তখত পুনরুদ্ধার করেছেন। এর কিছু পরেই এসে পড়েছিল রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। রাষ্ট্রপতির পদটি ছিল একান্তই ইন্দিরার ব্যক্তিগত উপহার দেওয়ার তালিকায়। চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী সবরকম হিসেব-নিকেশের তালিকাতেই নরসীমারাও-এরই ছিল অগ্রাধিকার। বাস্তবে ইন্দিরা গান্ধীর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জ্ঞানী জৈল সিং ছিলেন সেই অর্থে বহিরাগত। চূড়ান্ত মনোনয়ন হয় হয় এমনি একটা টানটান মুহূর্তে নরসীমারাও পাড়ি দিলেন এক অখ্যাত সরকারি বিদেশযাত্রায়। এই সময়ে জৈল সিং নরসীমারাওকে নিরস্ত করতে বুঝিয়েছিলেন দিল্লী ছেড়ে বিদেশ পাড়ি দেওয়ার এটা সঠিক সময় নয়। উত্তরে ইন্দিরাকে হাড়ে হাড়ে চেনা নরসীমারাও বলেছিলেন, শ্রীমতী গান্ধী যদি মনে করেন তাহলে 'টিমবকটু' বা 'আইসল্যান্ড' যেখানেই থাকি না কেন তিনি ঠিক তলব করবেন। আর যদি প্রয়োজন না থাকে তবে তাঁর বাড়ির বসার ঘরে অপেক্ষা করলেও তিনি কিন্তু নজর দেবেন না। যে সব নেতা টিকিটের আশায় দিল্লীতে পাড়ি জমিয়েছেন তাঁদের কাছে গল্পটি প্রণিধানযোগ্য। রাজনীতি যেহেতু আদতে মানুষকে নিয়ে উতার চড়াও-এর খেলা তাই এখানে বরাতজোরেরও একটু ভূমিকা থেকে যায়। আর ভাগ্য জড়িয়ে গেলেই সেখানে জন্মকুলজী, গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানের মতো অতি-প্রাকৃত বিষয়গুলি তো আসবেই। তবুও বলছি এই মনোনয়নের প্রক্রিয়াটা কিন্তু সব সময়ই পুরোপুরি ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের ওপর নির্ভরশীল নয়। ঝানু রাজনীতিবিদরা না মানলেও কথাটা সত্যি। আচ্ছা মূল সত্যিটা কি পাল্টায়? কে জেতার ক্ষমতা ধরে? মূল প্রশ্নটা একই থাকলেও ক্ষেত্র বিশেষে উত্তর প্রায়ই বদলে যায়।

এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া তাই নানান খুঁটিনাটি— এলাকার মানুষের বসতির চরিত্র, অর্থনৈতিক অবস্থা, অতীত নির্বাচনী পরিসংখ্যান নানান ছানবিন করার পরেই তৃণমূল স্তরে সেই বিশেষ ক্ষেত্রটির প্রার্থী নির্ধারিত হন। ওপরের বৈশিষ্ট্যগুলি ৬/৭টি বিধানসভার ক্ষেত্রেও একই ভাবে কম বেশি জড়িয়ে থাকতে পারে। সেই মানদণ্ডগুলিই প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে মনোনয়নের পাল্লায় হেরফের ঘটায়। এই ব্যবস্থায় একেবারে আদর্শ প্রতিনিধি নির্বাচন বলে কিছু হয় না। তবুও একটি কেন্দ্রে তো একটি দলের একজনই প্রার্থী থাকবেন। এমনি একটা পরিস্থিতিতে যখন নরেন্দ্র মোদী বিজেপি'র পক্ষে তুমুল আশার সঞ্চার করেছেন সেখানে উত্তরপ্রদেশ থেকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা নিয়ে নানান প্রশ্ন প্রতি-প্রশ্ন আসতেই পারে। কষ্টিপাথরে যাচাই করে প্রার্থী ঠিক করা যায় না।

বিজেপি-র লক্ষ্য

২০১৪-র নির্বাচনে বিজেপি-র কেন্দ্রীয় বিষয় দু'টি— (১) ভারতের পঙ্গু অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্যভাবে তুলে ধরা এবং (২) বিজেপি দেশের সকল ধর্ম, বর্ণ, জাতির মানুষকে এক সঙ্গে নিয়ে চলতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এই ভাবনা জনমানসে দৃঢ় করা। এই প্রক্রিয়াটিই হচ্ছে জনপ্রিয়তা থেকে সুশাসনে বিবর্তনের মূল রাস্তা। মানুষ বার বার দেখেছে জনপ্রিয় নেতার উত্থান। অনেকসময়ই এর পেছনে থাকে জনতার চলতি শাসক-বিরোধী আক্রোশ। এই বিরুদ্ধাচরণের রাজনীতি অপরিহার্য হলেও আসলে তো তা নেতিবাচক। সুশাসন কিন্তু সবসময়ই ইতিবাচক। এর পেছনে থাকে ভবিষ্যৎ কাজকর্মের একটি ইতিবাচক ইস্তাহার। শাসককে মনে রাখতেই হবে যে গরিষ্ঠাংশ মানুষের ভোটে নির্বাচিত কিন্তু সকলকেই সুশাসন দিতে সে দায়বদ্ধ।

নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয়তা আর বিচারসাপেক্ষতায় ঝুলে নেই। তা আজ প্রশ্নাতীত। এখন অনেকে ব্যক্তি ক্যারিসমা থেকে চলতি রাজনৈতিক ধারা বা প্যাটার্নের ওপর বেশি গুরুত্ব দেন। তাতেও আপত্তি কিছু নেই— তাঁরা নজর করলেই দেখতে পাবেন হালের রাজনৈতিক পরিযায়ীদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। এক সঙ্গে বিরাট সংখ্যায় না হলেও নিশ্চিতভাবে পলায়নের মিছিলটি বিজেপি-মুখী। কংগ্রেসের উঁচুতলার নেতৃত্ব ঠাণ্ডায় জমে পাথর হয়ে গেলেও তলার দিকে চলেছে অবিরাম ভাঙন।

অনেকেই দেখছেন দীর্ঘদিনের পোড়খাওয়া চিদাম্বরম দেওয়ালের লিখন হয়ত পড়ে ফেলেছেন। তিনি আর নিজের শিবগঙ্গা দুর্গকে নিরাপদ মনে করছেন না। অথচ পাঁচ বছর আগে হলে যেখান থেকে

হোক ঘাড় ধরে যেন তেন প্রকারেণ কংগ্রেসীরা ক্ষমতার অলিন্দে হত্যে দিতেন। এখন শুধু ছেলে-পিলেদের নিজেদের পূর্বতন কেন্দ্রে পাঠিয়ে প্রক্সি দেওয়া। নিজের রাজনৈতিক মৃত্যুর যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম করার পর উত্তরাধিকারীরা যাতে ২০১৯ সালে আসনটির হকদার থাকতে পারে। চমৎকার!

কংগ্রেসের অন্তিমদশা

চিদাম্বরমের উদাহরণ বাদ দিলে কংগ্রেসের নানান কিসিমের নেতা-নেত্রী তুলনামূলক নিরাপদ আসনের সন্ধানে বেরিয়েছেন। অথচ বাজারে সেই মাল একদমই নেই, কালো বাজারেও অমিল। অনেক ভাবী মন্ত্রী আবার তাঁদের সর্বশেষ (বিদায়ী) গুরুগম্ভীর টিভি সাক্ষাৎকার দিতে ব্যস্ত। অল্প কিছু বাস্তববাদী প্রবীণ নেতা তাঁদের নিজ নিজ নির্বাচন ক্ষেত্র আগলাতে বেরিয়েছেন, যদিও ভালই জানেন সেখানে তাঁদের সম্ভাবনা শূন্যের আশেপাশে। ওদিকে হরিয়ানার মতো কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে অর্ধেকের ওপর সাংসদ নির্বাচনে দাঁড়াতে চাইছেন না। তাঁরা হয়ত নির্বাচনী ফাটকাবাজদের (বুকি) কাছে তাদের সম্ভাবনা একাধিকবার বাজিয়ে হতাশাতেই থিতু হয়েছেন। কেননা ফাটকাবাজরা এবার কংগ্রেস দলকে দু' সংখ্যার কোটায় ধরেছে। শুধু কেরল ও অসমের ক্ষেত্রে কংগ্রেসী আসনপ্রার্থীদের কিছুটা চাহিদা আছে। যদিও অসমের ক্ষেত্রে কংগ্রেস যেরকম ভাল ফল আশা করছে তা নাও হতে পারে।

এমন মৃত্যুকালীন পরিস্থিতির কারণ বিশ্লেষণ আদৌ কঠিন নয়। নজর করলেই দেখা যাবে দেশের প্রতিটি কোণায় কোণায় এমনকি যেখানে বিজেপি-র আদৌ কোনো জয়ের সম্ভাবনা নেই সেখানেও মানুষ আন্তরিকভাবেই দিল্লীতে একটি কর্মক্ষম সরকার চাইছে। লক্ষণীয় এই দাবি কিন্তু জাতপাত নিরপেক্ষ। সুশাসনের আকাঙ্ক্ষা চিরাচরিত জাত-পাতের বেড়াজাল ভেঙে দিয়েছে। হ্যাঁ, কেবলমাত্র মুসলিম ভোটারদের বৃহৎ অংশই এখনও বিজেপি সম্বন্ধে সন্দিহান। কিন্তু তাঁদের মধ্যেও অনেকে আজ কংগ্রেস পরিচালিত ইউপিএ-২-এর কাজকর্মে সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ধ, ক্লান্ত। প্রশাসন ও শাসকহীনতার মূল্য আজ ভারতকে যে ভাবে চোকাতে হচ্ছে তা অতীতে কখনও হয়নি। অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাপকাঠিতে প্রতি ১ শতাংশ ঘাটতি থাকায় কয়েক কোটি ভারতবাসী গরিবি সীমারেখার পারে পৌঁছে যান। সাম্প্রতিক পাওয়া একটি নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই চলতি সরকার প্রায় ৭৫০টি পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পকে হয় বাতিল করেছে নয়ত আটকে দিয়েছে। এই প্রকল্পগুলি কার্যকর হলে দেশে কী পরিমাণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হোত তা ভেবে দেখলে বিমর্ষ হয়ে পড়তে হবে। এই চাকরিগুলির অপমৃত্যুর প্রতিক্রিয়াই যুবসমাজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে পথে ঘাটে।

এই পটভূমিতেই মোদীর উত্থানের তুল্যমূল্য বিচার জরুরি। মোদী গুজরাটে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানে জোয়ার এনেছেন। মানুষ সেই কর্মকাণ্ড সর্বভারতীয় ক্যানভ্যাসে দেখতে নয় তার সফল অংশীদার হয়ে জীবন বদলাতে। চায়। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় মোদী যখন ১০০টি ঝকঝকে নতুন শহর পত্তনের কথা বলেন তার অর্থ হলো নতুন নতুন চাকরি-প্রসবিনী বিপুলায়তন ইস্পাত কারখানা, সিমেন্ট তৈরির বিশাল আয়োজন। তিনি যখন দেশের বিদ্যুৎ বুভুক্ষ শহরগুলিতে ২৪ ঘণ্টা নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুতের প্রতিশ্রুতি দেন তখন তা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে কেননা তিনি তা গুজরাটে করে দেখিয়েছেন।

মনে রাখতে হবে, আজকাল শাসন কথাটি একটি বিশেষণ বহন করে চলে আর তা হলো স্থায়ী শাসন। অ-বিজেপি ফ্রন্টগুলি নির্মিতির আগেই ধ্বংস হয়ে গেছে। অন্যদিকে মাফলারবন্দী কেজরিওয়াল সমালোচনা না-পছন্দ হলেই যখন সাংবাদিকদের জেলে পোরার ভয় দেখানো, আবার পর মুহূর্তেই হাতে গরম ভিডিও প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তা অস্বীকার করেন—তখন বোঝা যায় তাঁর দম শেষ হয়ে এসেছে, কেননা সমর্থনও ক্ষীয়মান। ২০১৪-র নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদী ভোটারদের লাইনগুলোকে নির্দিষ্টভাবে ঠিক লক্ষ্যে ভাগ করে দিতে পেরেছেন, কিন্তু তাঁর দলের টিকিট-প্রত্যাশীদের দীর্ঘ লাইন তিনি মনে আনতে পারছেন না।

স্বস্তিকা

নববর্ষ সংখ্যা, ১৪২১

শক্ত ভারত, সমৃদ্ধ ভারত

২০১৪ পরিবর্তনের বছর। কেন্দ্রে সরকার পরিবর্তনের বছর। স্থায়ী কর্মক্ষম উন্নয়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সরকার গঠনের বছর। যে সরকার জাতিকে উপহার দিতে পারবে এক শক্ত ও সমৃদ্ধ ভারত। সেই ভারত গঠনে বিভিন্ন ক্ষেত্রের রূপরেখা কি হতে পারে তারই উপর আলোকপাত করেছেন মেঃ জেঃ কে কে গাঙ্গুলি, নবকুমার আদক, রবীন্দ্রনাথ পতি, সব্যসাচী বাগচী, অমিতাভ ঘোষ, তথাগত রায়, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, রণজিৎ রায় প্রমুখ।

সংরক্ষণযোগ এই সংখ্যাটির জন্য এখনই কপি বুক করুন। দাম একই থাকছে—১০ টাকা।

সর্বজনীন পিঠে ব্যাগ এবং স্কুলের ছেলেমেয়েরা

রমাপ্রসাদ দত্ত

এক আত্মীয় বলেছিলেন, 'আজকাল চেহারা দেখে বোঝা যায় না কে কি করে, কে কি পড়ে।' বাক্যটা অনেককে বলেছি, তাঁরাও স্বীকার করেছিলেন কথাটা পুরোপুরি খাঁটি। কয়েকবছর আগে ওই কথাটা বদলে আরেকজন বললেন, 'আজকাল পিঠের ব্যাগ দেখে বোঝা মুশকিল কে কি করে, কে কি পড়ে।' একথাটাও অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। ব্যাগব্যবসায়ী আর ফ্যাশন নিয়ন্ত্রকদের প্রচারকৌশলে পাঁচ থেকে পঁচাত্তর বছর বয়সীর পিঠে এখন নানান আকারের ব্যাগ। পুরুষ আর নারীর মধ্যে কোনো ভেদাভেদ রাখেনি। কয়েকবছর আগে পিঠে বওয়ার ব্যাগের ব্যাপক চলন ছিল না। দুম করে ব্যাগ-প্রেম এমন সংক্রামক চেহারা নিল কেন? যুক্তি একটাই, বোঝা কম আর বেশি হোক কাঁধের বদলে পিঠে বওয়া ভালো। শিরদাঁড়া যাতে মজবুত থাকবে। হাত দুটো ফাঁকা থাকলে অনেকরকম কাজের সুবিধে। দরকার হলে হাত নেড়ে বোঝানো যায় একে ওকে তাকে। আর বোঝানোতে কাজ না হলে হাত চালাতে অসুবিধে নেই। কিন্তু প্রতিপক্ষের আক্রমণ সামলাতে না পেরে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেলে শিরদাঁড়ায় চোট লাগার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকেই।

স্কুলের নিচু ক্লাসের ছাত্র কাঁধে ব্যাগ নিয়ে চলেছে। তার শরীরের ওজনের প্রায় অর্ধেক পিঠে চাপানো। ব্যাগে সব বই-খাতা, পড়ার সরঞ্জাম, জলের বোতল, টিফিন নিয়ে স্কুলে যাওয়া আর ফেরা। অনেক সময় ব্যাগটা বাবা-মা স্কুলের গেট পর্যন্ত নিয়ে যান, আবার ফেরার সময় নেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়ের পক্ষে অতটা ওজন বওয়া আর ব্যাগ সামলানো কঠিন। কিন্তু স্কুলের নিয়ম কড়া। দুর্বল চেহারার ছেলেমেয়েকে ব্যাগ বইতে হবে। সবল চেহারার ছেলেমেয়েকেও । স্কুল কর্তৃপক্ষ হুকুমজারি করে নিজেদের অঙ্ক ঠিক রাখেন। অথচ শিক্ষাবিদরা বলেছেন বারবার বলেছেন, 'সিলেবাসের বোঝা কমবে। পাঠ্য বই পাতলা হোক। খাতা পত্রও। প্রতিদিন সবই আনার দরকার নেই। এ ব্যাপারে ছেলেমেয়েদের কোনোরকম চাপ সৃষ্টি ঠিক নয়।' কিন্তু কে শুনছে কার কথা! একটু উঁচু ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরা স্কুলের পর টিউশন পড়তে যায় কোচিং ক্লাসে ওই ভারী ব্যাগ নিয়ে। তার টিফিনের কি ব্যবস্থা থাকে? দোকান থেকে কিনে দেওয়া মুখোরোচক ফাস্টফুড। যা তারা আনন্দ আর তৃপ্তিতে খায়। কিন্তু শরীরের পক্ষে তা যে মোটেই হিতকর নয় সেটা অভিভাবকদের কে বোঝাবে! তাঁরা অর্থব্যয় করেন, ছেলেমেয়ের কাছে ভালো ফল চান। দেহে মনে সুস্থ থেকে বড়ো হোক— সেটা চান কি? অনবরত চাপ দেন। মা বা বাবা দশ মিনিট খরচ করে নিজেদের হাতে ছেলেমেয়ের টিফিন তৈরিতে নজর দিলে ছোটরা আনন্দেই তা খাবে— এটা শিশু বিশেষজ্ঞরা বারবার বলছেন। ফাস্টফুডের রমরমা ব্যবসা বেড়েছে অভিভাবকদের দায়সারা মনোভাব ও দায়িত্বহীনতার জন্যেই আর তাতে ক্ষতি হচ্ছে ছেলেমেয়েদের। ছোটদের স্কুলের ব্যাগে টিফিন বাক্স থাকা জরুরি। তা ঠিকমতো গুরুত্ব পেলে আমাদের শিশু-কিশোরদের মঙ্গল। দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী একসময় বলেছিলেন, 'স্কুলের ছেলেমেয়েরা পিঠে বই খাতার ব্যাগ বয়ে নিয়ে যাক।' জওহরলাল নেহরুর মৃত্যুর পর পঞ্চাশ বছর পেরোতে চলল। সে সময় দেশের সব শিশুকে স্কুলে আনার চেষ্টা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু আনা যায়নি। দারিদ্র্য ছিল মূল বাধা। অনেক গ্রামে স্কুল থাকলেও সকলের পক্ষে স্কুলে যাওয়া সম্ভব হোত না। দারিদ্র্য যেমন ছিল, তেমনি ছিল সামাজিক উদাসীনতা। যারা স্কুলে আসা-যাওয়া করত তাদের মধ্যে অনেকেরই ব্যাগ ছিল না। কেউ কেউ হাতে করে বই আনত। এখন ছবিটা পাল্টেছে। গ্রামের স্কুলে ছেলেমেয়ে বেশি আসছে। তাদের অনেকের পিঠে ব্যাগ। কারো কারো বইপত্র থাকে পলিথিনের থলেতে। ব্যাগ কেনার সামর্থ্য থাকে না।

ট্রেনে ট্রামে বাসে ছোটরা স্কুল বা কলেজের ছাত্রছাত্রীরা পিঠে ব্যাগ নিয়ে উঠলে সাধারণত কোনও যাত্রী অসন্তুষ্ট হন না। কিন্তু পিঠে ব্যাগ নিয়ে এখন যাচ্ছে কারখানার মজুর অফিসের কর্মী এবং নানান পেশার অনেকেই। তাদের ব্যাগে বইপত্র নেই। কিছু ব্যক্তিগত জিনিস। জলের বোতল

টিফিন বাকসো সাজের বা নেশার সরঞ্জাম কারো কারো। ব্যাগ ঢাউস। ট্রামে বাসে আশপাশের লোকজনের যে অসুবিধে হয় সে বোধ থাকে না। গটগট করে চলেছে। হাত দুটো ফাঁকা। যেতে আসতে সুবিধে। কিন্তু অন্যের সমস্যা হলে লোকে বলবেই, 'সবাই যেন মাউন্টেনিয়ার হতে চায়। দরকার নেই পিঠে ভারি ব্যাগ নিয়ে চলেছে।' কোনো কোনো তরুণী পিঠের ব্যাগ অন্যদের অসুবিধে হবে বলে সামনে নেন। সেটা হলে দৃষ্টিশোভন মনে হয় না। বোঝার সমস্যা তাতে কমে কি? ব্যাগ-ব্যবসায়ীদের মহানন্দ, কত ব্যাগের কাটতি! নারীপুরুষের দল ছুটে চলেছে পিঠে ব্যাগ নিয়ে। গতি বাড়ছে কি? না দুর্গতিও। বড়রা যা খুশি করুক। তাদের হুজুগে মেতে ওঠার ব্যাপারটা আজ আছে, কাল থাকবে না।

স্কুলের বা কলেজের ছেলেমেয়েদের ব্যাগ তৈরির সময় তাদের প্রয়োজন ও বয়সের কথা ব্যবসায়ীদের মনে রাখা দরকার। সাড়ে সাত কিলোগ্রাম ওজন নিয়ে ফৌজিরা আগে চলতেন। এখন তাঁদের ওজন কমাবার কথা ভাবা হচ্ছে। কিন্তু স্কুলের ছোট ছেলেমেয়েদের পিঠে ব্যাগ চাপিয়ে বোঝা বাড়ানোর উদ্দেশ্যকে সবসময় মানা যায় না। আবার অনেক স্কুলে নির্দিষ্ট আকারের ব্যাগ না নিলে ছাত্রছাত্রীদের শাস্তি মেলে। যেমন কদিন আগে সল্টলেকের একটা স্কুল শাস্তি দিয়েছে ছোট্ট ছেলেদের নিজেদের তালিকাভুক্ত দোকান থেকে ইউনিফর্ম তৈরি না করানোর জন্যে। একটা স্কুলের কথা খবরে এসেছে। আরও বহু স্কুল একই নিয়ম চালু করেছে অলিখিত ভাবেই।

এজেন্টদের জন্য

অন্তত পাঁচ কপির কম স্বস্তিকার এজেন্সী দেওয়া হয় না। প্রতি কপি স্বস্তিকার জন্য ২০.০০ টাকা করে অগ্রিম জমা অবশ্যই রাখতে হবে।

প্রতি মাসের বিলের পাওনা টাকা অবশ্যই পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করা প্রয়োজন। অন্যথায় এজেন্সী বাতিল হতে পারে।

স্বস্তিকা ডাক, রেল ও সড়ক পরিবহন দ্বারা পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। ২৫ কপির কম পত্রিকা রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পাঠানো হবে না। রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পত্রিকা নিতে ইচ্ছুক এজেন্টকে নিকটবর্তী রেল স্টেশনের নাম বা পরিবহন সংস্থার নাম, ঠিকানা (পিন সহ) এবং ফোন নম্বর (যদি থাকে) জানাতে হবে।

নতুন এজেন্ট হলে অগ্রিম জমা টাকা সমেত সম্পূর্ণ নাম ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার।

আরও বিস্তারিত জানতে স্বস্তিকা দপ্তরে পত্রালাপ করুন। মুদ্রিত অফিসের মোবাইলে ফোন করতে পারেন।

— ব্যবস্থাপক

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের

ভাজা সামুই ব্যবহার ক(ন
মাত্র দুই মিনিটে (ীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর
মোবাইল -৯২৩২৪০৯০৮৫

KIND ATTENTION TO HOUSE OWNERS

"WATER SEAPAGE IS A DISEASE LIKE A CANCER OF YOUR DREAM HOME. REMOVE IT AND SAFE YOUR HOME"

OUR SERVICES :

** Heat & Waterproof Solution for your Heated Roof.
** Waterproof Treatment of Roof, roof Garden Water Tank, Lift Pit, Water Body Etc.
** Leakage, Dampness & Salt Petre Treatment.
** Anti-Termite & Pest Control Treatment

CONTACT :
Calcutta Waterproofing Company
'Park Plaza'
71, Park Street, Room No. 11/12, Kolkata-700 016
98311 85740/9831272657–
emil : roy4258@yahoo.com
web : www.calcuttawaterproofing.com

মুক্তির দিন আগত ওই : মোদীর দিন আগত ওই

শ্রীচৈতন্য বর্ধন

খেল্ জমে উঠেছে। রেফারি (ইলেকশন কমিশন) হুইসিল বাজালেই মোদীবাহিনী যেভাবে রে রে করে মাঠে নেমে পড়েছে, তাতে ভড়কে গিয়ে বিপক্ষ দলের সেনাপতি রাজকুমার মাঠের বাইরে চলে গেছেন এবং তার চামচা-ডাবু-গাড়ু-হাতা-খুন্তী-ঝাঁঝরার দল ''ভয় নেই আমরা আছি'' বলে ঘিরে ধরলেও সেনাপতির পতন ও মূর্চ্ছা ঘোচাতে সক্ষম হচ্ছে না। হাল হকিকৎ দেখে 'mummy'-ও 'mum' বনে গেছে। মুখ দিয়ে আর বাকি, সরছেন গণতান্ত্রিক পথে নেতা নির্বাচন হবে, আমাদের এক-নেতা-কেন্দ্রিক দল নয়— ইত্যাদি ছেঁদো কথায় আর চিড়ে ভিজছে না।

মোদীর বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তোলার তো বিরাম নেই। মোদী দাঙ্গাবাজ, মোদী চালবাজ, মোদী বিপক্ষ দলের উপর নজরদারি করে। মহিলা সাংবাদিকদের উপর বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করে ইত্যাদি তো আছেই এমনকি নারী গঠিত ব্যাপারেও মোদীকে জড়াতে দ্বিধা করে না। কিন্তু কোনও অভিযোগই বাজারে খাচ্ছে না। মোদীর উচ্চতা কিছুতেই নামাতে যখন পারছে না, তখন রাহুল গান্ধীকে মোদীর সমান উঁচু করে তুলতে কেউ পা কাঁধে তুলে নিয়েছে, কেউ পাছায় মাথা দিয়ে হেঁইও জোয়ান বলে হাঁকছে, কেউ বগলের তলায় দুহাত দিয়ে উপরে টানছে, কেউবা মুণ্ডু ধরে টেনে লম্বা করতে এমন জোরে টানছে যে, বেচারার ধড় থেকে মুণ্ড আলাদা হয়ে যাবার জোগাড়। তাতেও ব্যর্থ হয়ে বাঁশ দিয়ে লরীতে ঠাকুর তোলার কৌশলের মতো সহযোগী দলগুলিকেই বাঁশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হচ্ছে। কিন্তু ঠাকুর নিজেই যেখানে দাঁড়াবার ইচ্ছাশক্তি হারিয়ে ফেলেছে, সেখানে কতক্ষণ আর তাকে ঠেকো দিয়ে খাড়া রাখা যায়? মা পাশে থেকে, বোন অন্তরাল থেকে এবং ভগ্নীপতি গোপন আস্তানা থেকে ট্রেনিং দিয়েও খোকাবাবুকে জনমনোরঞ্জনী পরীক্ষায় পাশ করাতে পারছে না। কমা, সেমিকোলন, ফুলস্টপ ইত্যাদি যথাযথ স্থানে প্রয়োগ করতে না পারার ফলে নবপরিণীতা বধূ প্রবাসী স্বামীর কাছে চিঠি লিখতে গিয়ে যেমন লিখেছে— 'ভাসুর ঠাকুর একটি ছাগল, পিসিমার গালে লম্বা লম্বা দাড়ি। তোমার কপালে আমার পা''— রাজকুমারেরও সেই দশা। নির্বোধের দল এটা বোঝে না যে, কাঁসা-পিতল-কে যতই ঘষামাজা করা হোক, তাতে তার চাকচিক্য কিঞ্চিৎ বাড়লেও তা কখনই সোনা হয়না।

একান্ত নির্বোধ, নিরেট, স্থূলবুদ্ধি ছাড়া একথা কারো বুঝতে বাকি নেই যে, কংগ্রেসের দিন খতম হয়ে এসেছে। তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের যা অপেক্ষা। এখন গান্ধীর ছেঁড়া নামাবলী, নেহরুর বস্তাপচা বুলি, ইন্দিরা-রাজীবের মুর্খের মতো আত্মবলিদানের কাহিনীতে আর মানুষ বশীভূত তো দূরের কথা, অভিভূতও হয় না। ফলে নেহরু-গান্ধী পরিবারের দেশকে দেবার মতো আর কিছুই নেই। শেখ-ভজা সেকুমার্কা দলগুলি তাদের যতই তোল্লা দিক, বৃদ্ধ অথর্ব জীর্ণ শীর্ণ কংগ্রেসের শ্মশানযাত্রায় সামিল হয়ে অশ্রু বিসর্জনের মহড়া নিতে পারে।

জলে ডুবে মরার কালে মানুষ তৃণখণ্ডকে অবলম্বন করেও বাঁচতে চায়। গতায়ু কংগ্রেসের সামনে সেই তৃণখণ্ড রূপে আবির্ভূত হয়েছে মিঃ কেজরিবালের আম-আদমি পার্টি। লজ্জা ঘৃণা ভয় ও আত্মমর্যাদাহীন কংগ্রেস এখন ভারতীয় রাজনীতির জঞ্জাল রূপে আবির্ভূত আম-আদমি দলের আদলে গঠন করা যায় কিনা, তা পরীক্ষা করে দেখতে পারে। কংগ্রেসীদের এসব ব্যাপারে কোনও হেলদোল নেই। পতনোন্মুখ কংগ্রেস সরকারকে রক্ষা করতেই ঢাল বা শিখণ্ডী হিসেবে কেজরিওয়ালকে ব্যবহার করা হচ্ছে। কেজরিওয়াল বিনা পয়সায় জল ও অল্প পয়সায় বিদ্যুৎ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর মতো সস্তায় কিস্তিমাতের পথ ধরেছিল। কিন্তু পূর্বতন কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিতের শাসনকালে সঙ্ঘটিত আর্থিক দুর্নীতি সম্পর্কে স্পিক্‌টি নট'। কেজরিওয়াল ভালো করেই জানত যে, দুর্নীতি নিয়ে বেশি ট্যাঁ ফোঁ করতে গেলেই তার সরকারের 'ঠেকো' (আউটসাইড সাপোর্ট) সরে যাবে এবং তার সরকারের অবশ্যম্ভাবী পতন ঘটবে। সুতরাং ''অন্তরে বিষ মুখে মধু : লেকচার বক্তৃতায় শুধু'' সাধু সেজে গদি রক্ষা করে যাওয়াই শ্রেয়। কিন্তু তাও শেষ রক্ষা হয়নি।

আর কংগ্রেসও চাইছে শিখণ্ডীকে সামনে রেখে বিজেপি-র জয়যাত্রা ব্যাহত করা যায় কিনা। কিন্তু সে মতলবও হাসিল হবার লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। আম-আদমির আম ভোগ করছে কেজরিওয়াল আর আঁটি চুষছে কংগ্রেস। বিজেপিকে ঠেকাতে ছুঁচো গিলেছে— এখন ওগরাতে পারছে না। ফাঁস হয়ে গলায় আটকে রয়েছে। পরের পথে কাঁটা দিতে গিয়ে সে কাঁটায় বিদ্ধ হয়ে নিজেই কাতরাচ্ছে কংগ্রেস। কংগ্রেসের ত্রিশঙ্কু অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় নেই। তার ইতো নষ্ট, ততো ভ্রষ্ট অবস্থা। তাকে আর ভয় বা সমীহ কথার প্রশ্নই ওঠে না। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি— মুক্তির দিন আগত ওই : মোদীর দিন আগত ওই!

ধর্মের দীক্ষার সঙ্গে ধর্মরক্ষার দীক্ষা দিতে হবে

অমলেশ মিশ্র

আমাদের এই ভারতবর্ষে হিন্দু ধর্ম সংগঠনের সংখ্যা অনেক। কোনো কোনোটি এতই বিশাল যে বিদেশেও ওই ধর্ম সংগঠনের শাখা-প্রশাখা আছে। এই সব সংগঠনের প্রধান ব্যক্তিরা উচ্চ আধ্যাত্মিক মার্গের। নিজে মোক্ষ লাভে আকুল, শিষ্য-প্রশিষ্যদেরও মার্গদর্শন করান কীভাবে মোক্ষপ্রাপ্তি সম্ভব। বিষয়টি নিয়ে অনুধ্যান করলে প্রকট হবে যে প্রত্যেকেই ব্যক্তি মুক্তিতে উদ্বেগাকুল। তাঁরা নিজেদের কথা ব্যতীত অন্যদের কথা ভাবেন না, বিশ্বাস করেন যে গুরু নির্দেশিত পথে অভ্যাস করলে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করা যাবে।

যে সমষ্টি চিন্তা হিন্দু সমাজকে রক্ষা এবং বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন, সেই সমষ্টিচিন্তা প্রায় অনুপস্থিত। তাই হিন্দু সমাজ থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে যখন কেউ অন্য সম্প্রদায়ে যেতে বাধ্য হয় অথবা যখন দেশে বা বিদেশে হিন্দু নির্যাতন হয়, যখন হিন্দুত্বকে সাম্প্রদায়িকতার সমার্থক বলা হয়, তখন এদের কণ্ঠস্বর শোনা যায় না। অথচ এক একজন গুরুদেবকে কেন্দ্র করে বা কোনো গুরু-ভিত্তিক সংগঠনকে কেন্দ্র করে লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটি হিন্দু সংগঠিত অবস্থায় আছেন। এরা একবার যদি আওয়াজ দেন ধর্মান্তরকরণ বা হিন্দু নির্যাতনের বিরুদ্ধে, তাহলে সেই আওয়াজে যে গর্জন বা নিনাদ তৈরি হবে তা যে কোনো হিন্দু বিদ্বেষীকে ভীত, সন্ত্রস্ত ও নিরাশ করে দিতে পারবে। কিন্তু তা হয় না।

ধর্মসংগঠনগুলি তার ভক্তদের ভীষণভাবে আত্মমুখী করেছে, সমষ্টিমুখী করেনি। আমার অতি সীমিত জ্ঞানের মধ্যে একমাত্র প্রণবানন্দজী মহারাজকেই মনে পড়ে যিনি হিন্দু সমাজকে রক্ষা করতে সদা জাগ্রত ছিলেন। বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করেছি যে হিন্দু সন্ন্যাসী নামে খ্যাত বিবেকানন্দর ভক্তরাও হিন্দু এবং হিন্দুত্ব রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা নেননি। বিবেকানন্দ কত বিরাট পুরুষ ছিলেন এই প্রচার যত হয়, বিবেকানন্দের কর্মপদ্ধতি এবং হিন্দু ও হিন্দুত্ব রক্ষায় তার আহ্বান কদাচিৎ বাস্তবায়িত হয়। সেই সব সংগঠনের উদ্যোগে ছোট-বড়- মাঝারি যত বিবেকানন্দ মূর্তি স্থাপিত হয়েছে, তত সংখ্যক ভক্ত হিন্দু ও হিন্দুত্ব রক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করেননি।

ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা এই তত্ত্বের ব্যাখ্যায় এই ভক্তবৃন্দ নিজেদের পৃথিবী সম্পর্কে নিস্পৃহ নির্মোহ করেছেন। অথচ এদের অনেকেই, হয়ত দেখা যাবে, ব্যক্তি জীবনে এতটা নির্মোহ নন। তাহলে এই ভক্তদের হিন্দুসমাজ, হিন্দু এবং হিন্দুত্ব নিয়ে এতটা নিস্পৃহ বা নির্মোহ হওয়া কিছুটা অস্বাভাবিক।

একটু গভীরে গেলে মনে হয়, আসলে এঁরা নিজেদের ঝামেলা ব্যতীত অন্য ঝামেলা বা সংকট বিষয়ে মাথা ঘামাতে নারাজ। অন্য ঝামেলায় মাথা ঘামালে ব্যক্তিগত লাভ তো কিছুই হয়ই না বরং বিপরীতটাই স্বাভাবিক।

তাহলে স্বাভাবিক প্রশ্ন আসে— ব্রহ্ম সত্য, জগত মিথ্যা তত্ত্বটি কি মানুষকে সমাজ বিচ্ছিন্ন এক স্বার্থপর, আত্মমুখী ও আত্মসুখী জীব হিসাবে পরিচিত করতে চায়? জগত মিথ্যা ধরে নিয়ে জগত সম্পর্কে নির্মোহ হওয়ার অর্থ কখনই এটা নয় যে, জগৎ সম্পর্কে নিজ কর্তব্য এড়িয়ে যাওয়া। জগৎ মিথ্যা তখনই সত্য তত্ত্ব হবে যখন ফল সম্পর্কে মোহ না রেখে অবিচলভাবে করণীয় কাজটুকু করে যেতে পারব। জগৎ মিথ্যা তত্ত্বের এই ব্যাখ্যা নয় যে, যাবতীয় করণীয় কর্তব্যকে এড়িয়ে গিয়ে কেবল নিজের স্বার্থে নিমজ্জিত হওয়া।

বহু স্বামীজী, প্রভুজী এবং গুরুজী অলংকৃত এই ভারতবর্ষে হিন্দু ভক্তরা নিজের নিজের প্রভুজী, গুরুজী, স্বামীজীকে কেন্দ্র করে কতটা সংগঠন-নিষ্ঠ, ততটা হিন্দু এবং হিন্দুত্ব-নিষ্ঠ নন। যে মাটিতে গাছটি হয়েছে— সেই মাটি অবহেলিত, বৃক্ষটি আদরণীয়— কারণ সে ফল দেয়। কিন্তু মাটি যদি গুণান্বিত না হয়, বৃক্ষের অনুকূল সার এবং জলের যদি অভাব ঘটে, পিঁপড়ে-উই, সাপ ষণ্ড যদি মাটির ক্ষতি করে— গাছটি আদরণীয় ও ফলবতী থাকতে পারে না। হিন্দু ভক্তদের কাছে নিজ নিজ প্রভুজী, গুরুজী, স্বামীজী যতই আদরণীয় হোন, যে মাটিতে আশ্রয় করে তিনি অবস্থান করছেন— সেই মাটি সেই হিন্দু সমাজ অধিকতর আদরণীয়। সেই মাটিকে দূষণ মুক্ত রাখা, বৃক্ষ থেকে ফল ভক্ষণকারী ভক্তদের অবশ্য করণীয় কাজ। তাই হিন্দু এবং হিন্দুত্ব যখনই আক্রান্ত হবে প্রত্যেক ভক্ত হিন্দুকে তার প্রতিরোধ করতে হবে। 'হিন্দুদের বিলুপ্ত করা যাবে না, 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা', 'এ সংসার মায়া' ইত্যাদি আপ্তবাক্য ভক্তকে সমাজের প্রতি দায়িত্বহীন, স্বার্থপর একটি অভিমুখী জীবে পরিণত করছে। গুরুজী, প্রভুজী এবং স্বামীজীকে রক্ষা করতে হলে হিন্দু সমাজ ও হিন্দুত্বকে রক্ষা করতে হবে। এই রক্ষার কাজে প্রয়োজনে সহিংস, আক্রমণকারী ও যোদ্ধা হতে হবে। ক্লীবত্ব-ভক্তি নয়।

ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষ রাজারূপে, সৈন্যরূপে এবং সাধারণ মানুষরূপে প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে হিন্দু সমাজ ও হিন্দুত্বকে রক্ষার জন্য আত্মোৎসর্গ করেছিলেন বলেই, ভক্তদের গুরুজী, স্বামীজী ও প্রভুজীর জন্ম, অবস্থান ও ব্যাপ্তি ঘটেছে। যারা আত্মবিসর্জন দিয়ে হিন্দু সমাজ ও হিন্দুত্বকে রক্ষা করেছেন— তাঁদের আদর্শে আমাদের অনুপ্রাণিত হওয়া দরকার।

তাই হিন্দু বুদ্ধিজীবী শুধুমাত্র নন, হিন্দুভক্তদের তাদের গুরুজী, স্বামীজী ও প্রভুজীদের, তাদের ধর্মসংগঠনগুলির হিন্দু সমাজ ও হিন্দুত্ব রক্ষায় সংগ্রামী হওয়া জরুরি, ধর্মের দীক্ষার সঙ্গে ধর্মরক্ষার দীক্ষা দিতে হবে।

শোষণের বিরুদ্ধে দুইজী আম্মা

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগ থেকে মাত্র ৫০ কিলোমিটার দূরে বিন্ধ্যাচলের পাহাড়-জঙ্গলে ঘেরা শঙ্করগড় এলাকাকে এক সময় অতি অনুন্নত পিছিয়ে পড়া অঞ্চল হিসাবে লোকেরা জানতো। রুজি-রুটির একমাত্র মাধ্যম ছিল পাথর খুঁড়ে বের করে ভেঙে টুকরো করা। পুরোটা পাথুরে এলাকা। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের পরও আজ থেকে দুই দশক আগে পর্যন্ত এখানে

দুইজী আম্মা (বাঁ দিকে)। তাঁর প্রেরণায় কর্মরত মহিলারা।

জমিদার ও অত্যাচারী ঠিকাদারদের শাসনই চলতো। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর সন্ধ্যায় কত মজুরি পাওয়া যাবে তা ঠিক করত এইসব জমিদারের লোক অথবা ঠিকাদাররা।

চার দশক আগে নিকটবর্তী শহর চিত্রকূটের কাছে মনকা গ্রাম থেকে রুজি-রুটির সন্ধানে বাবুলাল ও তাঁর পত্নী দুইজী দেবী শঙ্করগড় আসেন। অন্য শ্রমিকদের মতো এই পরিবারও সারাদিন পরিশ্রম করে কোনোরকমে একমুঠো খেতে পেত। ক্রমে ক্রমে বাবুলাল ও দুইজী দেবীর চার পুত্র ও ছয় কন্যা জন্মে। ১২ জনের খরচ চালানো তাঁদের পক্ষে খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। দুইজী আম্মা বলতেন আমাদের দুজনের একজন যদি কোনোদিন কাজ যেতে না পারি তবে সেদিন পেট ভরে খাবার তৈরি করা যায় না। এরকম অবস্থায় ছেলে-মেয়েদের মানুষ করা খুব কঠিন ছিল। নিরুপায় হয়ে যদি ঠিকাদারের কাছ থেকে টাকা ধার নেওয়া হয় তো সেদিন থেকেই দুর্দিন শুরু হয়ে যায়। মহিলাদের সঙ্গেই বেশি অন্যায় করা হোত। পুরুষদের সমান কাজ করেও পারিশ্রমিক পাওয়া যেত অর্ধেক। তাছাড়া ইতর জমিদার বা ঠিকাদারেরা মহিলাদের যৌন শোষণ করার রাস্তা খুঁজতো। তাদের নেকড়ের দৃষ্টি মহিলাদের শরীরের ওপর থাকতো।

সংঘর্ষ কীভাবে শুরু হয়েছিল প্রশ্ন করলে মেয়েদের বিয়ের সময় হলো, তখন মনে হলো কিছু করতে হবে। অন্য মজদুরদের মনও খারাপ ছিল। সবার মনে শোষণের বিরুদ্ধে আক্রোশ তো ছিলই কিন্তু ভয়ও ছিল— ঠিকাদাররা যদি এক হয়ে কাজ দেওয়া বন্ধ করে দেয়? কিন্তু যখন আর পারছিলাম না তখন শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছি। চীৎকার করেছিলাম। তাতে পুরো এলাকা ভূমিকম্পের মতো কেঁপে উঠেছিল। ঠিকাদাররা এক হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু অন্যদিকে মজদুররাও সংগঠিত হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল। সংঘর্ষের পরিস্থিতি দেখে প্রশাসন হস্তক্ষেপ করে ও মজদুরদের দাবিদাওয়া মেনে নেয়। ফলে অবৈধ খনন বন্ধ হয়ে যায়। এতে শ্রমিকদের অভাব আরো বেড়ে যায়। যারা ঠিকাদারদের থেকে ঋণ নিয়েছিল তারা খুবই অসুবিধায় পড়ে। কিন্তু এই আন্দোলনের ফলে ঠিকাদারদেরও লোকসান হতে শুরু করে। তাদের আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে যায়। শেষে পারিশ্রমিক নির্ধারিত হয়ে সমঝোতা হয়। যারা ঋণ নিয়েছিল তাদের পারিশ্রমিক থেকে ধীরে ধীরে কেটে নেওয়া হবে স্থির হয়। এই আন্দোলনের পরিণাম এই হলো যে, ঠিকাদারদের অবৈধ মালিকানা বন্ধ হয়ে সরকার হাতে নেয় ও সরকারের তরফ থেকে পারিশ্রমিক দেওয়া শুরু হয়। তা সত্ত্বেও মজদুরদের সমস্যা এত তাড়াতাড়ি শেষ হওয়ার ছিল না। ঠিকাদাররা স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে শ্রমিকদের আবার অত্যাচার করতে শুরু করে। মাল বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। যারা বাইরে থেকে পাথর বা গিট্টি কিনতে আসে তাদের পুরনো ঠিকাদারেরা হুমকি দিত। তাড়িয়ে দিতে শুরু করে। কিন্তু আমরা হার স্বীকার করতে রাজি ছিলাম না। সবাই মিলে পুলিশ-প্রশাসনের উপর মহলে ব্যাপারটা জানাই। তখন ধীরে ধীরে পরিবেশ ঠিক হয়। কিন্তু ১৯৯৫ সালে দুইজী আম্মার স্বামী বাবুলালের হঠাৎ মৃত্যু হয়। তাঁকে সুপরামর্শ দেওয়ার আর কেউ থাকলো না। ঈশ্বরের আশীর্বাদে হাজার হাজার হাত তাঁকে সহযোগিতা করতে এগিয়ে এল। দুইজী আম্মা বললেন— ''আন্দোলন করার সময় অনেকবার আমার পরিবার ও সহযোগীরা পুলিশের অত্যাচারের শিকার হয়, কিন্তু আমরা হার মেনে নিইনি।'' দুইজী আম্মার বয়স এখন ৭২ বছর পূর্ণ হয়েছে। তিনি এখন শঙ্করগড়ের জুহী কোঠী গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। গ্রামের স্কুলে 'মিড ডে মিল' দেখাশুনা করেন। বললেন— ''দীর্ঘ লড়াই চলেছে। ২০০২ সালের পর আজ আমরা অর্ধেক সফলতা পেয়েছি। বাকি ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যাবে।'' এখন আম্মার হাঁটুতে খুব ব্যথা, হাঁটতে কষ্ট হয়। তবু যদি কেউ কোনো সমস্যা নিয়ে আসে তো সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে যান।

জুহী কোঠী গ্রামের নিরঞ্জন বললেন— ''আম্মার কারণেই এলাকার এক ডজন গ্রামের ৫০০-রও বেশি মজদুর পরিবারে স্বচ্ছলতা এসেছে ও তারা সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে শিখেছে। ২০১০ সালে 'জি নিউজ'-এর পক্ষ থেকে আম্মাকে সম্মানিত করা হয়েছে। এত বড় আন্দোলন পরিচালনা করার বিষয়ে আম্মাকে বললে তাঁর জবাব— 'সবার ভালোর জন্য আমি করেছি, আপন-পর দেখিনি'। ২০০৫ সালে ভারত সরকার নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য আম্মার নাম পাঠিয়েছিল।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক
পড়ুন ও পড়ান

স্বস্তিকা

গ্রাহক হোন, গ্রাহক করুন
সডাক বার্ষিক গ্রাহকমূল্য
৪০০্ টাকা

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

"নিজ অন্তরের স্বধর্ম উপলব্ধি করার এই শ্রেষ্ঠ আহ্বান নিজেদের উচ্চাভিলাষের জন্য নয়, এমন কি, ভারতের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যও নয়, এইখানেই সমগ্র জগতের কাছে ভারতের প্রয়োজন। ভারতের মহান সংস্কৃতি, সুমহান ঐতিহ্য, আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার— জগতে এসব প্রয়োজন ছিল।"

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

‘কেন আমি বিজেপি-তে যোগদান করলাম’

অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেছেন, কেন আমি ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছি। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আমাকে সতেরো বছর আগে ফিরে গিয়ে শুরু করতে হবে। তাতে উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ছাড়াও আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে পশ্চিমবঙ্গবাসীর সামনে আনা যাবে। যেগুলি সাধারণ মানুষের জানার অধিকার আছে।

—ড. বিক্রম সরকার

পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতের অনেকেই জানেন না আমি আই.এ.এসে চাকুরি করতাম। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর সরকারি চাকুরি করার পর আটান্ন বছর বয়সে ১৯৯৭ সালে অবসর গ্রহণ করি। এই দীর্ঘ সময়ে রাজ্যে এবং কেন্দ্র সরকারে দিল্লীতে চাকুরির সুবাদে রাজনীতির নেতাগণ যাঁরা মন্ত্রীপদে ছিলেন তাঁদের কাজ, তাঁদের দেশপ্রীতি (বা তার অভাব), তাঁদের মনোভাব জানার সুযোগ হয়েছিল। চাকুরি জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে গত শতাব্দীর নব্বই-এর দশকে দেখেছি কীভাবে দাম্ভিক মন্ত্রীগণ ও তাঁদের দলের ‘বড় নেতাগণ’ সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষাকে কিভাবে তুচ্ছজ্ঞানে অবহেলা করে নিজেদের এবং কিছুটা নিজের দলের আখের গোছানোর কাজে লাগিয়েছে। এগুলি খুব কাছ থেকে দেখেছি। ১৯৯৬-এর নভেম্বর/ ডিসেম্বরে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে গঙ্গানদীর জলবিভাজন নিয়ে পার্লামেন্টের বাহিরে এবং পার্লামেন্টের ভিতরে আলোচনা ও আন্দোলন হয়। আমি তখন কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান থাকার সুবাদে, আমাকে কলকাতা পোর্ট তথা ভারতের স্বার্থের সপক্ষে তথ্যপূর্ণ বক্তব্য রাখতে হয়। যেটা ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী দেবেগৌড়া, পরে (এখন প্রয়াত) ইন্দ্রকুমার গুজরালের ও রাজ্যের তখনকার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর মনঃপুত হয়নি। তার জন্য আমাকে চাকুরিতে খেসারত দিতে হয়েছে। যাক্ সে কথা। সেই সময় ভারতীয় জনতা পার্টির বরিষ্ঠ নেতা লালকৃষ্ণ আদবানী এই নিয়ে ফরাক্কা (মুর্শিদাবাদ) গিয়ে আন্দোলন করেন। ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী মহাশয় আমাকে বিজেপি-তে যোগদানের জন্য আহ্বান জানান। তিনি তখন বিজেপি-র জাতীয় ভাইস-প্রেসিডেন্ট এবং এই রাজ্যের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। যেহেতু আমি তখনও সরকারি চাকুরি করতাম, তাই স্বাভাবিক কারণেই সাড়া দিতে অক্ষম ছিলাম। আমি ১৯৯৭-এর এপ্রিলের শেষে সরকারি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করি। তখন আমার কাছে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর পক্ষে Vigilance Commission-এর চেয়ারম্যান এর পদের প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু আমার চাকুরি জীবনের শেষ পর্যায়ের কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতার জন্য তা গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। বুঝেছিলেম যে চাকুরিতে উন্নতি করত হলে চাকুরিজীবনে এবং পরে অবসর-প্রাপ্তির পর re-employment পেতে গেলে মন্ত্রীদের অন্যায়, অসঙ্গত অনৈতিক ‘Order’ মতো কাজ করা ছাড়া গতি নেই। নীতি-সঙ্গত ভাবে চাকুরি করতে গেলে কত বিপদের সম্মুখীন হতে হয় তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে post-retirement চাকুরি গ্রহণ অসঙ্গত বলে মনে হয়েছিল। তাই চাকুরির মেয়াদের শেষে আবার ‘স্বাধীনতা’র স্বাদ। স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হবার ইচ্ছা প্রবল হলো। এবং তাই স্বাধীন আইন ব্যবসা শুরু করি। কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট হিসেবে আগেই enrol করা ছিল, তার পরে সুপ্রীম কোর্ট ও enrolled হই।

সেই সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয় কংগ্রেস পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন ও নতুন পার্টি তৈরি করেন এবং আমাকে সেই নতুন দল তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করতে আহ্বান জানান। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে আমি ২৯ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে শ্যামবাজারের মোড়ে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রকাশ্যে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করি। তখন বিজেপি পার্টি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সদ্য প্রতিষ্ঠিত "West Bengal Trinamool Congress" দলের সঙ্গে সমঝোতা করে একসঙ্গে ১৯৯৮-এর মার্চ মাসের লোকসভার নির্বাচনে লড়াই করে পশ্চিমবঙ্গে। হাওড়া লোকসভা কেন্দ্রে আমাকে তৃণমূলের প্রার্থী করা হয়। সহযোগী দল বিজেপি-র কর্মীগণ আমাকে জয়ী করার জন্য সকলপ্রকার সহযোগিতা করেন। আমার রাজনৈতিক জীবনের গোড়াতেই হাওড়া বিজেপি কর্মীভাই-বোনদের ভালবাসা আন্তরিকতা আমাকে অত্যন্ত মুগ্ধ করেছিল এবং সেই ফার্স্ট ইমপ্রেশন আমার মনে একটি স্থায়ী দাগ কেটে আছে।

আমি যখন দ্বিতীয়বার লোকসভা নির্বাচনে (উপনির্বাচন, জুন ২০০০) মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া (বর্তমানে এই লোকসভার আসনের নাম ঘাটাল) থেকে দাঁড়াই তখনও লক্ষ্য করেছি বিজেপি-র কর্মীগণ আমার সপক্ষে সুন্দর কাজ করেছিলেন; এই বিষয়ে আমি বিজেপি নেতা ও তদানীন্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী তপন সিকদার মহাশয়ের সহযোগিতা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। আমার ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদানের প্রধান কারণ হিসেবে বলি যে

আমি একজন জাতীয়তাবাদী ভারতীয়—সেটাই আমার গর্ব। ভারতের অখণ্ডতা রক্ষা করা সর্বপ্রথম দায়িত্ব। বিজেপি ছাড়া আর কোনো দলই এই অখণ্ডতা রক্ষার কাজ করছে না। বিভিন্ন প্রকারের বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি অন্য সব দলগুলিকে কাজে লাগিয়ে দেশের অখণ্ডতাকে বিপন্ন করছে। জাতির নামে, সম্প্রদায়ের নামে, পরস্পর বিরোধী কাজ করে চলেছে, যেগুলি দেশের স্বার্থের পরিপন্থী। আমাদের প্রতিবেশী বাংলাদেশে যে ধরনের অস্থির অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা খুবই আশংকাজনক। বিদেশী শক্তিও এতে জড়িত সেইরকম অস্থিরতা যাতে ভারতেও দেখা দেয়, তার চেষ্টাও বিদেশীশক্তি বিভিন্নভাবে করে চলেছে। পাকিস্তানের ভারত-স্বার্থ-বিরোধী কার্যকলাপ সমাজে চলছে, তাতে সভ্য বিদেশী জাতি পুরোপুরি বর্তমান। তারা কেউই চায় না যে ভারত প্রগতির পথে এগিয়ে চলুক, উন্নতির পথে এগিয়ে চলুক।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দল দেশকে এই বিষয়ে নেতৃত্ব দিতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ। এই কঠিন সংকট সময়ে ভারতবাসীকে একত্রিত করে সার্বিকভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির পথে নিয়ে যেতে পারে, নায়কত্ব দিতে পারে একমাত্র দল ভারতীয় জনতা পার্টি। এবার বিজেপি-র নরেন্দ্র মোদী সেই নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছেন। দেশের মানুষের মন জয় করতে, মানুষের মনে আশার সঞ্চার করতে পেরেছেন। তার স্বচ্ছ, বলিষ্ঠ উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিতে সমগ্র ভারত এগিয়ে আসছে। "উন্নয়ন, উন্নয়ন এবং উন্নয়ন' নরেন্দ্র মোদীর এই মন্ত্রে দেশবাসীর বিশ্বাস জন্মেছে। দেশে কংগ্রেসী সরকার গত দশ বছর ধরে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবনতি ঘটিয়েছে। আর্থিক দুর্নীতি, স্ক্যাম, প্রশাসনের অস্বচ্ছতা সব মিলিয়ে সারা দেশকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। দেশের নবযুবকগণ বেকারত্বের কবলে পড়ে হতোদ্যম। আর তারা অপেক্ষা করতে চায় না। কংগ্রেসের উপর তাদের বিশ্বাস নেই; তাই তারা পরিবর্তন চাইছে। দেশের এই দুর্দিনে রিজিওন্যাল দলগুলি সবাই দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকারকে ব্ল্যাকমেল করে চলেছে। তারা সারা ভারতের ব্যালান্স, সম্যক উন্নয়নের কথা ভাবছেই না। জওহরলাল নেহরু'র সময় থেকেই কংগ্রেসের আমলে দেশের পিছিয়ে পড়া অংশগুলিকে ক্রমাগত অবহেলিত হতে দেখা গেছে। তাই রিজিওন্যাল দলগুলির সৃষ্টি হয়েছে দেশের অবহেলিত অংশগুলিতে। খণ্ড খণ্ড ভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতায় আসার জন্য। একমাত্র ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস পার্টিকেই প্রধানত এই অবস্থার জন্য দায়ী করা যায়। এখন দেশবাসী বিকল্প চাইছে, আর তা হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি।

তাই আমার এই দলে যোগদানের সিদ্ধান্ত। সেই সঙ্গে আমি মনে করি, দেশকে বাঁচানোর জন্য বিজেপি যুবশক্তিকে এগিয়ে নিয়ে এসে নেতৃত্বের ভার দিক। এটা আমার মতে অবশ্য কর্তব্য। আজকের যুবক অনেক বেশি সাহসী। আমার বয়স পঁচাত্তর, দুবার লোকসভার সদস্য হয়ে দেশের কাজ করেছি। তাই এবার নেতৃত্বের অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁদেরকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি যে লোকসভা নির্বাচনে আমার মতো বয়স্কদের (সিনিয়র সিটিজেন, আর কি) উচিত যুবাদের জায়গা করে দেওয়া; তারাই দেশের ভবিষ্যৎ। আমার জ্ঞান বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা দিয়ে দলের সংগঠনের জন্য কাজ করা উচিত বলে আমি মনে করি। আর সেই সঙ্গে যুবা নেতাদের সাহায্য করা। আমাদের দেশ এক বিশেষ যুগসন্ধিক্ষণে উপনীত হয়েছে। দেশের মানুষ, বিশেষ করে যুবকরা দেশ গঠনের কাজে এগিয়ে আসছে। সবরকম অপপ্রচার ও সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে লড়াই করছে। দেশকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের পথে নিয়ে যেতে চাইছে। আর গুজরাটের বর্তমানের উন্নতির রূপকার শ্রী নরেন্দ্র মোদী এই বিষয়ে যে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিতে সক্ষম তা ভারতের অধিকাংশ মানুষই বুঝতে পেরেছে। ভারতের সম্যক উন্নয়নের স্বার্থে, ভারতবাসীর উন্নতির স্বার্থে তাই সবাই চাইছে এবার ২০১৪-তে বিজেপি দেশকে নেতৃত্ব দিক, নতুন পথ দেখাক।

(লেখক প্রাক্তন সাংসদ এবং আই এ এস অফিসার)

গ্রাহকদের জন্য

স্বস্তিকার সডাক্ বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা। বিশেষ সংখ্যাগুলি সমেত।

স্বস্তিকার গ্রাহক হতে ইচ্ছুক ব্যক্তি নিজ নাম ও ঠিকানা (পিন কোড নম্বর সহ) এবং ফোন নম্বর (যদি থাকে) স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে। বছরে যে কোনও সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়।

পত্রালাপের সময় অবশ্যই আমাদের দেওয়া গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করবেন। মনে রাখবেন গ্রাহক নম্বরের পাশেই যে তারিখটি লেখা হয় সেই তারিখেই আপনার গ্রাহক মেয়াদ শেষ হচ্ছে। অতএব উক্ত তারিখের পূর্বেই পরবর্তী বছরের জন্য নির্ধারিত বার্ষিক গ্রাহক মূল্য জমা দিয়ে গ্রাহক মেয়াদ নবীকরণ করতে হবে।

স্বস্তিকা দপ্তর থেকে প্রতি সপ্তাহে সোমবার পত্রিকা ডাকে দেওয়া হয়। সময়মতো পত্রিকা না পেলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ নেবেন। বারবার ডাকের গোলমাল হলে Chief Post Master General, West Bengal Circle, Yogajog Bhawan, P-36, C.R. Avenue, Kolkata - 12 — এই ঠিকানায় লিখুন। — ব্যবস্থাপক

মোদী হাওয়াতেই সওয়ার হতে চাইছেন বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দেবশ্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ লড়াইটা এতদিন ছিল কৃষি বনাম শিল্প। এবার তার অভিমুখ পাল্টেছে। কৃষিশিল্প একজোট হয়েছে। অপর পারে রয়েছে 'পলিটিক্স'। যাঁর সৌজন্যে এটি হলো তিনি এবারের বিজেপি প্রার্থী দেবশ্রী চৌধুরী। বর্ধমান জেলার ভূমিকন্যা নন বটে কিন্তু বর্ধমান- দুর্গাপুর কেন্দ্রে এই মুহূর্তে তাঁর ওপরই আস্থা রাখছেন এলাকাবাসী। গত লোকসভা নির্বাচনের আগে পর্যন্ত পুরো এলাকাটা ছিল বলাই বাহুল্য লালদুর্গ। পার্টির প্রভাবশালী অংশ ছিল নিরুপম সেন, মদন ঘোষদের অনুগামী। এঁদের শিল্পপ্রীতিতে হাঁসফাঁস দশা ছিল জেলার কৃষকদের। গত লোকসভা নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে অবস্থা পাল্টালো। শিল্পপ্রেমীরা বিদায় নিলেন, কৃষিপ্রেমীরা এলেন। এবার জেলায় শিল্প- মহলের অসহনীয় দিন কাটানোর পালা। এই শিল্প বনাম কৃষির চোটে সামগ্রিকভাবেই এককালে সমুন্নত বর্ধমান জেলা ক্রমশই পিছিয়ে পড়েছে। এর মধ্যে বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের ক্ষেত্রে কথাটা আরও বেশি করে সত্য। কারণ এতে একদিকে যেমন বর্ধমান উত্তর, বর্ধমান দক্ষিণ, মন্তেশ্বর, ভাতার গলসি-র মতো কৃষিপ্রধান অঞ্চল রয়েছে। অন্যদিকে দুর্গাপুর পূর্ব ও দুর্গাপুর পশ্চিমের মতো শিল্পপ্রধান এলাকাও রয়েছে। রাজনৈতিক দিক দিয়েও লোকসভা কেন্দ্রটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্ধমান ও দুর্গাপুর-এর মতো দু'দুটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পুরসভা রয়েছে এর মধ্যে। পঞ্চায়েত এলাকাগুলোর মধ্যে রয়েছে সাতগাছিয়া ১, বর্ধমান ১ ও ২, ভাতার, গলসি-১, কাঁকসা ব্লকের সাতটি পঞ্চায়েত, গলসি ২-এর দুটি পঞ্চায়েত, মেমারি ২-এর দু'টি পঞ্চায়েত ও মন্তেশ্বর ব্লকের ১০টি পঞ্চায়েত।

মূল লড়াইটা হবার কথা ছিল বামফ্রন্টের শেখ মহিদুল হক ও তৃণমূলের মমতাজ সঙ্ঘমিত্রার মধ্যে। কিন্তু বালুরঘাটের লড়াকু নেত্রী দেবশ্রী চৌধুরীর আবির্ভাব বাম ও তৃণমূল শিবিরের অনেক অঙ্ক পাল্টাতে বাধ্য করছে। এই লড়াইয়ে তিনি অবশ্যই আন্ডারডগ। কিন্তু শিল্প বনাম কৃষির টানাপোড়েনে নাজেহাল বর্ধমান-দুর্গাপুরের মানুষ একটু বাঁচতে চাইছিলেন। নরেন্দ্র মোদীর নতুন ভারত গড়ার স্বপ্নে ফেরি করে তাঁদের সেই বাঁচার স্বপ্ন দেখাচ্ছেন দেবশ্রী। প্রার্থীর নিজের কথায়--- 'সুশাসন, উন্নতশীল, দারিদ্র্যমুক্ত, ভয়হীন একটি নির্ণায়ক সরকার গঠনের যে আহ্বান নরেন্দ্র মোদী রেখেছেন, বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের মানুষ সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে সংসদে বিজেপি প্রার্থীকে পাঠাবেন বলে আমার বিশ্বাস।' তাঁর আরও বক্তব্য— 'পশ্চিমবঙ্গের বন্ধ্যা-রাজনীতির ফলে শিল্প-কারখানা লাটে উঠেছে। কর্মসংস্থান বন্ধ হয়েছে। কৃষিতেও অন্ন সংস্থান হয়নি। ফলে বেকারত্ব, দারিদ্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে। দৃঢ়ভাবে আমি এই বন্ধ্যা রাজনীতি দূরীকরণের চেষ্টা করবো।'

আপাতত দেবশ্রীর ওপর ভরসা করেই আশায় বুক বাঁধছেন এই লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি কর্মীরা। লড়াকু এই নেত্রীর পুরো পরিবার দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ। দেবশ্রী চৌধুরীর বাবা প্রয়াত দেবীদাস চৌধুরী ছিলেন বালুরঘাট জেলায় ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। এই পরিবারের প্রতিটি মানুষের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ওতপ্রোত যোগাযোগ রয়েছে। দেবশ্রী জানালেন--- 'পরিবারই আমার রাজনীতির প্রেরণা'। তিনি নিজেও ছোটো থেকে দেশের কাজে নিবেদিতা। ছাত্র জীবনে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের নেত্রী ছিলেন। ১৯৯৫ সালে পরিষদের কলকাতা শাখার সভানেত্রীও হন। এরপর বিজেপি-র যুব সংগঠন ভারতীয় জনতা যুব মোর্চায় ২০০১

সালে যোগদানের মাধ্যমে জাতীয় রাজনীতির অঙ্গনে পা রাখেন তিনি। ২০০৬-এ বালুরঘাট বিধানসভা কেন্দ্রে রাজ্যের মন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরীর বিরুদ্ধে তাঁর অবিস্মরণীয় লড়াই রাজনৈতিক মহলকে চমকে দিয়েছিল। ওই কেন্দ্রে ৩৯ শতাংশ ভোট পেয়ে সামান্য ব্যবধানে হেরে যান তিনি। বাংলা সাহিত্যে স্নাতকোত্তর করা কৃতী ছাত্রী, বাগ্মী, রাজ্য বিজেপি-র প্রথম সারির বক্তাদের অন্যতমা দেবশ্রী যে ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করতে (যেটা অধিকাংশ রাজনীতিবিদই করে থাকেন) রাজনীতিতে আসেননি বরং দেশবাসীকে সমৃদ্ধ করার তাগিদে আদর্শকেই হাতিয়ার করে রাজনীতির ময়দানে নেমেছেন, নিজের জীবনচর্যার প্রতিটি পদক্ষেপে তার নজির রেখেছেন তিনি। অবিবাহিতা দেবশ্রী দেশের কাজে নামার জন্য কোনও লাভজনক সংস্থায় যোগ পর্যন্ত দেননি। আক্ষরিক অর্থেই তিনি দেশের স্বার্থে নিবেদিতা।

আর এই জায়গা থেকেই বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রে বিজেপি-র অবস্থান কিছুটা সুবিধাজনক। নইলে পরিসংখ্যান মোটেই বিজেপি-র পক্ষে অনুকূল নয়। গত লোকসভা নির্বাচনে বাম-প্রার্থী পেয়েছিলেন ৫০.৫২ শতাংশ ভোট। তৃণমূল-কংগ্রেস জোটের পক্ষে ভোট পড়েছিল ৪০.৯৮ শতাংশ। সেখানে বিজেপি প্রার্থীর কপালে জুটেছিল ৪.৪১ শতাংশ। তবে এটাও ঠিক যে বিগত লোকসভা নির্বাচন থেকেই বাম- বিরোধী ভোট এককাট্টা হওয়ার প্রবণতা টের পাওয়া গিয়েছিল। এরপর বিধানসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই প্রবণতা উত্তরোত্তর বেড়েছে। যার ফলে বামেদের হাত থেকে তৃণমূলের হাতে চলে গিয়েছে ভোট বাক্সের ব্যাটন। ভোট কমেছে বিজেপি-রও। কিন্তু এবারের পরিস্থিতি সম্পূর্ণই ভিন্ন। মোদী হাওয়া এতই প্রবল যে প্রাক্-নির্বাচনী সমীক্ষায় এখনও পর্যন্ত যা ইঙ্গিত তাতে বারো শতাংশের বেশি ভোট এ রাজ্যে সামগ্রিকভাবে পেতে চলেছে বিজেপি। এই শতাংশ আরও বাড়বে বলে নির্বাচনী সমীক্ষকদের ইঙ্গিত। বিজেপি-র পক্ষে এই ভোট প্রবণতা জারি থাকলে দেবশ্রী চৌধুরী যে এই লোকসভা কেন্দ্রে বড় ফ্যাক্টর হতে চলেছেন তা নিয়ে নিঃসন্দেহ প্রায় সব মহলই।

দুর্গাপুরের মানুষের কাছে দুঃখের একটা বড়ো জায়গা বিধানচন্দ্র রায়ের স্বপ্ন বাস্তবায়িত না হওয়া। ১৯৮৬-৮৭ সিপিএমের শ্রমিক রাজনীতিতে একের পর এক চালু কারখানা বন্ধ হয়ে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল শ্মশানে পরিণত হবার যে প্রবণতা শুরু হয়, পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে তা চূড়ান্ত আকার লাভ করে। স্বাধীন বাংলার রূপকার বিধানচন্দ্রের স্বপ্ন রাতারাতি দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়। দেবশ্রী মনে করেন গুজরাটের শিল্পোন্নয়নে নরেন্দ্র মোদী যে পথিকৃৎ ভূমিকা নিয়েছেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী হলে তাঁর এই উন্নয়নমুখীতা সারা দেশেই ছড়িয়ে পড়বে। যার সুফল থেকে দুর্গাপুরও বঞ্চিত হবেন না। তাই তিনি জিতুন বা হারুন দুর্গাপুরের শিল্পস্থাপনের দিশারী হয়ে বিধান রায়ের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে মরিয়া। দুর্গাপুরবাসী এই আশ্বাসটুকু শোনার জন্যই সিকি শতাব্দী অপেক্ষা করেছে।

যে বর্ধমান ছিল একদা সারা দেশের মধ্যেই কৃষিতে সম্পন্ন জেলা, আজ সেখানে কৃষকের আত্মহত্যার মিছিল চলছে কেন, সে প্রশ্ন সঙ্গতভাবেই তুলছেন দেবশ্রী। এক্ষেত্রে তিনি অতীতের বাম সরকারের সঙ্গে বর্তমান তৃণমূল সরকারকেও দূষছেন। কারণ তাঁর মতে বামেদের ভুলের মাসুল যেমন বর্ধমানের কৃষকেরা দিয়েছেন, তেমনি তৃণমূলের স্বপ্ন দেখিয়েও বঞ্চনা করার দায়ও ঘাড় পেতে নিয়েছেন জেলার কৃষিজীবী মানুষ।

পাশাপাশি এই দুই সরকারেরই প্রতারণার শিকার হয়েছেন রাজ্য তথা জেলার বেকার যুবক-যুবতীরা। নরেন্দ্র মোদীর কর্মসংস্থান-পরিকল্পনায় এঁদের সুরাহার আশ্বাস দিচ্ছেন বিজেপি-প্রার্থী। সঙ্গে সঙ্গে দেবশ্রী জানাচ্ছেন জিতলে বিগত সাংসদদের মতো সংসদে কেবল 'হাত তুলে' নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য সমাধা না করে নিজের কেন্দ্রের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে সংসদে সোচ্চার হবেন তিনি। ১৯৭০টি বুথে ১৪ লক্ষ ২৮ হাজার ১২৩ জন নির্বাচকমণ্ডলীর দাক্ষিণ্য এখন কোন দিকে যায় তার দিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

এক নজরে
বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্র

- **বর্ধমান ও দুর্গাপুর পুরসভা এই আসনের মধ্যে রয়েছে**
- **সাতগাছিয়া ১, বর্ধমান ১ ও ২, ভাতার, গলসি ১, কাঁকসা ব্লকের সাতটি পঞ্চায়েত, গলসি ২ এর দুটি পঞ্চায়েত, মেমারি ২ এর ছ'টি পঞ্চায়েত এবং মন্তেশ্বর ব্লকের ১০টি পঞ্চায়েত এই কেন্দ্রের অন্তর্গত।**
- **এই লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা হলো— বর্ধমান দক্ষিণ, বর্ধমান উত্তর, মন্তেশ্বর, ভাতার, গলসি, দুর্গাপুর পূর্ব এবং দুর্গাপুর পশ্চিম।**
- **গত লোকসভা নির্বাচনে (২০০৯) বামপ্রার্থী ভোট পান ৫০.৫২ শতাংশ। তৃণমূল ও কংগ্রেস জোট ৪০.৯৮ শতাংশ। বিজেপি ৪.৪১ শতাংশ।**
- **গত বিধানসভা নির্বাচনে (২০১১) বামপ্রার্থী ভোট পান ৪৫.৬ শতাংশ। তৃণমূল ও কংগ্রেস জোট ৪৯.১ শতাংশ। বিজেপি ৩.৩৩ শতাংশ।**
- **গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামফ্রন্ট পায় ৩৪.১১ শতাংশ। তৃণমূল ৫৫.৩৯ শতাংশ। কংগ্রেস ২.৭৬ শতাংশ। বিজেপি ২.৭৫ শতাংশ।**

পাহাড়বাসী-আদিবাসীবহুল ডুয়ার্স ও সমতলের মানুষের মৌলিক সমস্যার সমাধান করবে বিজেপি : এস এস আলুওয়ালিয়া

প্রবীণ রাজনীতিবিদ এবং দলের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়াকে ভারতীয় জনতা পার্টি দার্জিলিং লোকসভা আসনে প্রার্থী করেছে। ১৯ মার্চ দুপুর প্রায় একটা নাগাদ শ্রী আলুওয়ালিয়া সদলবলে শিলিগুড়িতে আসেন। তাঁকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে স্বাগত জানান দলের জেলা সভাপতি রথীন বোস, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি, জলপাইগুড়ির প্রবীণ বিজেপি নেতা রবীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, দলের সর্বভারতীয় প্রশিক্ষণ সমিতির সদস্য পঞ্চানন রাউত এবং বিজেপি ও গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা (জি.জে.এম) দলের নেতা ও কর্মীসমর্থকরা। তবে 'মডেল কোড অফ্ কনডাক্ট' মেনে যতটা স্বাগত সম্বর্ধনা দেওয়া সম্ভব তার বাইরে যাননি কেউই।

শহরের যানজট এড়িয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে সাংবাদিক সম্মেলনে পৌঁছতে তাঁর একটু দেরি হয়ে যায়। প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং-ই একমাত্র জেতা আসন বিজেপি-র। সেই আসনে এবার তিনিই বিজেপি-র প্রার্থী। তাঁর জীবনের বেশিরভাগ বাংলাতেই কেটেছে। পড়াশোনা জন্মস্থান আসানসোল ও কলকাতায়। বিয়েও বাংলায়। আগাগোড়া তিনি বাংলাতেই কথাবার্তা বললেন। একে জেতা আসন, তার উপর এরকম জবরদস্ত প্রার্থী অন্য সবার কপালে যে ভাঁজ ফেলেছে একথা বলাই বাহুল্য। তাঁর এই ব্যস্ত সময়ের ফাঁকে 'স্বস্তিকা'র প্রতিনিধি বাসুদেব পাল-কে তিনি এক সাক্ষাৎকার দেন। সেই স্বল্প সময়ের সাক্ষাৎকারটি এখানে তুলে ধরা হলো।

□ আপনি কি 'গোর্খাল্যান্ড'-এর সমর্থন...

□ বিজেপি ছোট রাজ্য গঠনের পক্ষে। সুশাসন ও উন্নয়নের জন্য তার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ কারণেই অটলজীর নেতৃত্বে এনডিএ সরকার মধ্যপ্রদেশ থেকে ছত্তিশগড়, বিহার থেকে ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ থেকে উত্তরাখণ্ড রাজ্য তৈরি করেছে। কোনও রক্তপাত হয়নি। এমনকী তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠন ভারতীয় জনতা পার্টি সমর্থন না করলে তা তো সম্ভবই হোত না। বিল পাশ হোত না। প্রতিক্রিয়া সকলেই দেখেছেন।

□ বিজেপি-র ইস্তাহারে কি 'পৃথক গোর্খাল্যান্ড'-এর উল্লেখ থাকবে?

□ (প্রশ্নকর্তা সাংবাদিককে) আপনি তো অনেক জানেন দেখছি। আপনি নিশ্চয়ই ২০০৯ নির্বাচনী ঘোষণাপত্র পড়েছেন? সেখানে ছিল— ''গোর্খাল্যান্ড সমস্যা তথা আদিবাসী জনজাতিদের সমস্যাগুলো সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। এবারও একই কথা থাকবে। এরপরেও গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা আমাদেরকে সমর্থন করেছে (পাশে বসা রোশন গিরিকে দেখিয়ে)। পাহাড় ও সমতলের সমান্তরাল উন্নয়নের উপর সমান জোর দেওয়া হবে। দু'টি ক্ষেত্রের মধ্যেকার ফাঁক ভরাট করা হবে। গ.জ.মো.-র সহযোগিতায় আগেরবার যশবন্ত সিংহ জয়ী হয়েছিলেন, কিন্তু বিজেপি (এনডিএ) সরকার গঠন করতে পারেনি। বিরোধী আসনে বসেছে। এবার বিজেপি গরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার তৈরি করবে। পাহাড়বাসী আদিবাসী- জনজাতিবহুল ডুয়ার্স এবং সমতলের মানুষের মৌলিক সমস্যার সমাধান করা হবে।

□ গোর্খাদের (গ.জ.মো.) নেতা সমর্থকদের গ্রেপ্তার কি রাজনৈতিক প্রতিহিংসা?

□ এর ফলে জি.টি.এ চুক্তিকে অমান্য করা হচ্ছে। ২০১১-তে রাজ্য সরকার (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের-টিএমসি), কেন্দ্র সরকার ও গ.জ.মো.-র মধ্যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হয়। সেই চুক্তির ২৯ ও ৩০ নং ধারায় উল্লেখ আছে— গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের সময় যে সকল গোর্খাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে— তার মধ্যে 'হত্যা বাদে' অন্য সকল মোকদ্দমা প্রত্যাহার করা হবে। বর্তমানে এর বিপরীত ব্যবহার হচ্ছে। সরকার ওই সব মামলার ভিত্তিতে টার্গেট করছে। একদিনেই ৬০০ ওয়ারেন্ট জারি হয়েছে। যে সকল গ.জ.মো.-কর্মী সমর্থক তৃণমূল-কংগ্রেসে চলে গেছেন তাদের বিরুদ্ধে কোনও কিছুই হচ্ছে না। ওদের বিরুদ্ধেও তো মামলা রয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বদলা'র রাজনীতি করছেন। এটা রুটিনমাফিক সরকারি আদল যেমনটা পুজোর সময়েও হয়।

□ প্রয়োজনে কি সরকার গড়তে টিএমসি-র সমর্থন নেবেন?

□ তার দরকার হবে না। বিজেপি একাই ২৭২$^{+}$ আসন জিতবে। দেশবাসী কংগ্রেস শাসন থেকে মুক্তি চান, মোদীজীর নেতৃত্বে উন্নয়নের সরকার চান। মণিপুর, অরুণাচলের পাসিঘাট, বরাক ভ্যালির শিলচর, কলকাতায় মোদীজীর সভাতে ব্যাপক ভিড় হয়েছে। ১২ কোটি যুবক-যুবতী প্রথম ভোট দেবেন। তারাও মোদীজীকে প্রধানমন্ত্রীপদে দেখতে চান।

শহীদ প্রশান্ত মণ্ডলের বলিদান দিবস

গত ১৬ মার্চ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মুরারীপুর গ্রামে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও প্রশান্ত মণ্ডল স্মৃতিরক্ষা সমিতির যৌথ উদ্যোগে অমর শহীদ প্রশান্ত মণ্ডল-এর বলিদান দিবস পালিত হয়। শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ-এর পূর্ব ক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত ও উত্তরবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক গোবিন্দ ঘোষ, ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগঠন সম্পাদক অনিল রায় এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সঙ্ঘচালক যোগেন মাহাতো প্রমুখ। ১৯৮৪ সালের এই দিনে সঙ্ঘস্থানেই তৎকালীন শাসক দলের মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীদের আঘাতে প্রশান্ত শহীদ হন। প্রশান্ত মণ্ডল-এর স্মৃতিচারণ করেন তাঁরই ভাইঝি। প্রায় দেড় শতাধিক গ্রামবাসী ও স্বয়ংসেবক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। শহীদ মণ্ডল-এর স্মৃতিতে হিলি থানার কৃতী কৃষক বিষ্ণুপদ চক্রবর্তীকে 'অন্নদাতা ভারত গৌরব কৃষক' সম্মানে সমিতির পক্ষ থেকে ভূষিত করা হয়। পূর্ব ক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত তাঁর হাতে স্মারক হিসেবে ভারতমাতার সুন্দর ছবি তুলে দেন। অনুষ্ঠানে বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী বিশ্বপ্রিয় রায়চৌধুরীও উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষা সঙ্ঘের জেলা সম্মেলন

বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের আহ্বানে গত ১ ও ২ মার্চ দক্ষিণ ২৪ পরগণার বকখালিতে বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষা সঙ্ঘের রাজ্য শিক্ষা কন্‌ভেনশন্‌ ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্মেলন হয়ে গেল। কন্‌ভেনশনের উদ্বোধন করেন আর এস এসের প্রান্ত সঙ্ঘচালক অতুল কুমার বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের উচ্চশিক্ষা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মহেন্দ্র কুমার, বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী অনিমেষ দে, নারায়ণ চন্দ্র পাল, স্বপন সমাদ্দার চৌধুরী প্রমুখ। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিজ্ঞানী ড: জিষ্ণু বসু। নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে জেলা সমিতি গঠিত হয়— সভাপতি— উৎপল মণ্ডল, সহ-সভাপতি— ইন্দ্রনাথ প্রামাণিক, বিষ্ণুপদ মণ্ডল। সম্পাদক— কানুপ্রিয় দাস, সহ-সম্পাদক— কার্তিক মান্না, গৌরহরি মণ্ডল, সুজিত মাল। কোষাধ্যক্ষ— বিদ্যুৎ কুমার সর্দার, সহ-কোষাধ্যক্ষ—চন্দন ভৌমিক। সদস্য— সঞ্জয় সিন্‌হা, মিহির জানা।

ভারতীয় নববর্ষ উৎসব

কলকাতার 'ভারতীয় নববর্ষ প্রচার সমিতি'-র উদ্যোগে ৩০ মার্চ রবিবার সন্ধ্যা ৫-৩০ মিনিট থেকে ৬-৩০ মিনিট পর্যন্ত 'ভারতীয় নববর্ষ' (বিক্রম সংবৎ ২০৭১) বরণের এক ভব্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ৩১ মার্চ ২০১৪ এবছর বর্ষপ্রতিপদ অর্থাৎ যুগাব্দ ৫১১৬ শুরু হবে। এই অনুষ্ঠান কলকাতায় এ বছর ৪র্থ বর্ষে পদার্পণ করছে। সমিতির সভাপতি বিমল লাঠ এই উৎসবে সবাইকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার আবেদন জানিয়ে বলেছেন, 'ভারতীয় নববর্ষ সম্পর্কে সমাজে সচেতনতা সৃষ্টি করাই এই অনুষ্ঠানের লক্ষ্য।

হাওড়া-শিবপুরে হরিনাম সংকীর্তন

প্রতি বছরের মতন এই বছরেও হাওড়া, শিবপুরের কেশব স্মৃতি ভবন থেকে গত ১৬ মার্চ দোল পূর্ণিমার প্রভাতে বিশ্ব হিন্দুপরিষদের পরিচালনায় খোল করতাল সহকারে হরিনাম সংকীর্তন এলাকার পথগুলি পরিভ্রমণ করে। উপস্থিত ছিলেন ডাঃ সুধীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রথীন্দ্রমোহন বন্দোপাধ্যায়, বালকৃষ্ণ নায়েক, সিদ্ধার্থ বৈরাগী, পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, দিলীপ ব্যানার্জী, পবিত্র চক্রবর্তী, হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য, পিনাকী মুখোপাধ্যায়, কাঞ্চন ভট্টাচার্য, সঞ্জিত দে, অশোক রায়, তপন নাগ প্রমুখ।

মঙ্গলনিধি

গত ১৯ ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়ির ঠাকুর পঞ্চানন নগর কার্যবাহ তরুণ পালের শুভবিবাহ উপলক্ষে তাঁর বাবা ও মা প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন প্রান্ত প্রচারক গোবিন্দ ঘোষের হাতে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রান্ত প্রচার প্রমুখ বাসুদেব পাল, প্রান্ত সহ-কার্যালয় প্রমুখ অঙ্কুর সাহা-সহ অনেক কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক।

***

গত ৫ মার্চ বীরভূম জেলার ননগড়ের সঙ্ঘ শুভানুধ্যায়ী কুনাল দেবনাথ তাঁর শুভবিবাহ উপলক্ষে প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন উত্তর মুর্শিদাবাদ জেলার প্রাক্তন সেবাপ্রমুখ মুকুল হালদারের হাতে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মালদহ বিভাগ সম্পর্ক প্রমুখ নির্মল নাথ-সহ অনেক কার্যকর্তা।

শোকসংবাদ

কলকাতা উত্তর বিভাগ সম্পর্ক প্রমুখ মদনমোহন সিংহের মাতৃদেবী সুফলা সিংহ গত ৪ মার্চ রাত্রিতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কালিকাখালি গ্রামের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। তিনি দুই কন্যা, দুই পুত্র ও নাতি-নাতনি রেখে গেছেন।

***

গত ১৪ মার্চ হাওড়া জেলার সম্পর্ক প্রমুখ সৌমেন দাসের পিতা পশুপতি দাসের জীবনাবসান হয়েছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর।

***

খড়্গপুরের সবচেয়ে পুরানো স্বয়ংসেবক লক্ষ্মণলাল সাহু গত ১৪ মার্চ পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে লক্ষ্মণজীর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। ১৯৬৯-তে তিনি নাগপুরে

তৃতীয় বর্ষ প্রশিক্ষণ নেন। খড়্গপুরে রামমন্দির নির্মাণে তাঁর অবদান অসামান্য। অন্তিম সংস্কারের সময় অনেক স্বয়ংসেবক ও সঙ্ঘানুরাগী উপস্থিত ছিলেন।

***

অধ্যাপক অমরনাথ মেহেরোত্রা গত ২১ মার্চ শান্তিনিকেতনে তাঁর নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর এক পুত্র, এক কন্যা ও স্ত্রী আছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বৎসর। অমরনাথ মেহেরোত্রা বিশ্বভারতী সোস্যাল ওয়ার্ক বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। কন্যাকুমারীতে বিবেকানন্দ স্মারক শিলা মন্দির নির্মাণে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবধারার প্রচারে বোলপুরে বিভিন্ন সামাজিক কাজে যুক্ত ছিলেন।

অমরনাথবাবু রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আজীবন স্বয়ংসেবক ছিলেন এবং সঙ্ঘের সকল কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতেন।

গত ৪ মার্চ ডাঃ সুজিত ধর ফাউন্ডেশন আয়োজিত 'নবযুগের বার্তা : হিন্দুত্ব' শীর্ষক আলোচনা সভায় দি স্টেটসম্যান-এর সিটি এডিটর তরুণ গোস্বামী ও টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি-র অধ্যাপক ড. স্বরূপপ্রসাদ ঘোষ।

গত ২৩ মার্চ শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয় বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিত যশরাজ-কে রাষ্ট্রীয় শিখর প্রতিভা সম্মান ২০১৪-এ ভূষিত করে। সুর-সম্রাজ্ঞী শ্রীমতী গিরিজাদেবী এই সম্মান তাঁর হাতে তুলে দেন। অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছেন (বাঁদিক থেকে) অরুণ মল্লাবত, ড. প্রভাকর শ্রোত্রিয়, মহাবীর বজাজ, ড. প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠি, কৃষ্ণস্বরূপ দীক্ষিত, যুগলকিশোর জৈথলিয়া, মোহনলাল পারীখ, শ্রীমতী দুর্গা ব্যাস।

FOR INTERIORS THAT EVOKE ADMIRATION

For over two decades, Centuryply has been effortlessly redefining interiors into designer spaces with the most stunning range of products that reflect the very best of style, innovation and functionality.

CENTURYPLY
Quality that's a class apart!
Fortifying interiors with innovations like the first flexible ply, a 7 year termite-proof, pay back guarantee and many more…

CENTURYVENEERS
Exotic designs in wood!
Beautifying Interiors with an exclusive and wide range of Decorative veneers (only BWR available in India) & Senzura Styles, handpicked from around the world...

CENTURYLAMINATES
Style that stands out!
Trendsetting interiors with the widest range of laminates having myriad textures, stunning patterns and exquisite designs…

Also available:
CENTURYMDF
CENTURYPRELAM

CENTURYPLY®

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
31 March - 2014

সুস্বাগতম্ ভারতীয় নববর্ষ

বিক্রম সং ২০৭১ চৈত্র শুক্ল ১, সোমবার, দিনাঙ্ক ৩১ মার্চ ২০১৪ যুগাব্দ ৫১১৬

ভারতীয় নববর্ষ বিক্রম সম্বত ২০৭১-এর
উপলক্ষে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক কার্যক্রম

'জয়তু ভারত মাতরম্'

তারিখ : ৩০ মার্চ ২০১৪, রবিবার
(চৈত্র অমাবস্যা, বি. সং. ২০৭০)
সময় : সন্ধ্যা ৪.৩০ মিনিট থেকে
স্থান : লেক টাউন, 'বি ব্লক' পার্ক
(বড় পার্ক), কলকাতা
কার্যক্রমের সরাসরি সম্প্রচার সিটি ভক্তি চ্যানেল এবং ৩৫ এম এম চ্যানেলে

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সিদ্ধহস্ত কলাকার
বাবা সত্যনারায়ণ মৌর্য দ্বারা

এই মহতী অনুষ্ঠানে আপনার সপরিবার,
সবান্ধব উপস্থিতি কামনা করি।

"যার নিজ গৌরব তথা নিজ সংস্কৃতির মর্যদাবোধ নেই
সে মানুষ নয়, নির্বোধ পশু এবং মৃতের সমান"
— রাষ্ট্রকবি শ্রী মৈথিলিশরণ গুপ্ত

ভারতীয় নববর্ষ প্রচার সমিতি

৪২, কালী কৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৭, দূরভাষ - ৯৮৩০৩ ৭২৭৭৬, ৯৪৩৩০ ৫১৬৮৭, ৯৯০৩০ ১৪৩৩২
E-mail : b.navavarsha@gmail.com

Media Partners :
প্রভাত খবর | SITI | স্বস্তিকা | 35

দাম : ১০.০০ টাকা